# ভাষার প্রতি ভালোবাসা

# ভাষার প্রতি ভালোবাসা

**সম্পাদনায়**
ড. এমএ ইউসুফ খান

**ভাষার প্রতি ভালোবাসা * সম্পাদনায়: ড. এমএ ইউসুফ খান**
প্রকাশকাল * একুশে বইমেলা ২০১৯
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৫৫২-৪৬০৯৯৪, ০১৫৫৮-৪০৫৪৫৮
গ্রন্থস্বত্ব * সম্পাদক
প্রচ্ছদ ও বর্ণ বিন্যাস * ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ।
বাঁধাই * আবু তালেব বুক বাইন্ডিং
১০৪ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য * ৪০০/- (চারশত) টাকা
মূল্য: ৫$ ইউএস ডলার

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯২৯২৬-৮-৫

ISBN: 978-984-92926-8-5
**Bhasar Proti Bhalobasa by Dr. MA Yousuf Khan**
Published by Chayyanir.Shantikunja More, Bisic Road,
Thanapara, Tangail, 1900.
Date of Publication Ekushey Boimela 2019
Copy Right: Editor
Cover design & Book Setup: Chayyanir Computer
Price: TK. 400/- (Four Hundred Only)
Price: 5$US Dolar

## উৎসর্গ

ভাষার প্রতি যাদের ভালোবাসা
তাদের তরে।

# ভূমিকা

পৃথিবীতে বাঙালি এক অনন্য জাতি। তারা স্বাধীনতাপ্রিয়, শান্তিবাদী আর সংগ্রামী হিসেবে সুপরিচিত। তারা মানবাধিকার সুরক্ষায় সোচ্চার। বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মজলুম মানুষের পাশে থাকা, অন্যায় অবিচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তাদের আজন্ম বৈশিষ্ট্য। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে তারা বিভিন্ন দেশে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। দেশহারা রোহিঙ্গাদের পাশে মানবিক দরদ নিয়ে তাদের অবদান বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করেছে। তাদের নীতি হচ্ছে 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়।

বাংলা এক প্রাচীন জনপদ। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নামে এর পরিচিতি। বঙ্গ থেকে এর নাম এখন বাংলাদেশ। এদেশের মানুষ বরাবরই স্বাধীনচেতা। আর্যরা যখন এদেশে আসে, তখনই এ জাতির মুখোমুখি হয়। তারা বঙ্গ জনপদ দখল করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে। তাদের ভাষায় বাঙালিরা নীচ জাতি, রাক্ষস শ্রেণির অসভ্য বর্বর, তাদের ভাষা কদর্য পক্ষীর ভাষা ইত্যাদি। বিশ্ববিজয়ী গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের অভিযানের সময় বর্তমান বাংলাদেশ ছিল তার নাগালের বাইরে।

আর্যদের পর অনেক আগ্রাসী জাতি এদেশ আক্রমণ করেছে, কিছু সময় দখল করে শাসন করেছে। প্রতিবারই বাঙালিরা শাসন-শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তুর্কি মোগল মগ পর্তুগিজ, ইংরেজ ও পাকিস্তানিরা তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

বাঙালি জাতি অনেক দেশপ্রেমিক মানুষের জন্ম দিয়েছে। তাদের মধ্যে মোগল আমলে বীর ঈশা খাঁ, নবাবী আমলে শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদদৌলা, ইংরেজ আমলে বীর শহিদ তিতুমীর, হাজী শরীয়ত উল্লাহ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ফকির মজনু শাহ, পাকিস্তান আমলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের নাম নিত্যস্মরণীয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনি বাঙালি জাতিকে দেশপ্রেমে দীক্ষা দিয়ে ইস্পাতদৃঢ় ঐক্য সৃষ্টি করেন। তিনি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তার নামে আর আহ্বানে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে যে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাতে বীর বাঙালিরা মাত্র নয়মাসে পৃথিবীর অন্যতম যুদ্ধবাজ বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজয় বরণে বাধ্য করে এবং স্বাধীনতার সোনালি বিজয় অর্জন করে। সেই মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতি ৩০ লক্ষ প্রাণ, দুই লক্ষ নারীর সম্মান ও কোটি কোটি টাকার সম্পদ উৎসর্গ করে।

বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন স্বাধীন সার্বভৌম জাতি গঠন এবং সোনার বাংলা গড়তে। কিন্তু চক্রান্তকারীরা তাকে সে সুযোগ দেয়নি। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট কালরাতে তাকে সপরিবারে হত্যা করে। ভাগ্যক্রমে বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান তার কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। শেখ হাসিনা পিতার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। তিনি দেশ ও জাতির হাল ধরেছেন। দীর্ঘদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নশীলতার পথ ধরে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নিঃসংশয়ে বলা যায়, অচিরেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। বাংলাদেশ ছিল, বাংলাদেশ থাকবে। অবিনাশী বাংলা।

বাঙালির দৃষ্টিতে মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির অধিকার ও মর্যাদা সমান্তরাল। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলার স্থলে উর্দু চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল, যা মাতৃভাষাপ্রেমী বাঙালি জাতি রুখে দিয়েছিল। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি তারা জীবন দিয়ে বাংলাভাষার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। সেই ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত 'একুশে ফেব্রুয়ারি' এখন 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে বিশ্বস্বীকৃত ও নন্দিত। একইভাবে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে আসামে যে ভাষা আন্দোলন হয়, তাতে জীবন দেয় ১১ জন বাঙালি। বাঙালিই একমাত্র জাতি, যারা মাতৃভাষার জন্য জীবন দিয়েছে। শত প্রতিকূলতার মাঝেও বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার উন্নয়ন উৎকর্ষ ও সম্ভাবনা বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলা এক অবিনাশী ফল্গুধারা।

বাঙালির দেশপ্রেম ও ভাষাপ্রেম অতুলনীয়। বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা নিয়ে প্রতিনিয়ত গবেষণা হয়। দেশের বরেণ্য লেখকগণ এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখা লিখে থাকেন। তাদের কিছু নির্বাচিত লেখা নিয়ে গ্রন্থনা করা হলো 'ভাষার প্রতি ভালোবাসা'। আশা করি, পাঠকগণ বইটি সাদরে গ্রহণ করবেন।

**ড. এমএ ইউসুফ খান**

# সূচি

ক্রমিক নং-----------------------------------------------------------পৃষ্ঠা
**১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-----------------------------------------------১৩**
 বায়ান্নের দিনগুলো
**২. শেখ হাসিনা--------------------------------------------------------------২১**
 ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছরপূর্তিতে মূল্যবান ভাষণ
**৩. মোস্তফা জব্বার-----------------------------------------------------------৩৩**
 বাংলা ভাষার সোনালি সময়
**৪. ড. হায়াৎ মামুদ---------------------------------------------------------৫৮**
 কী ভুল লিখি কেন লিখি
**৫. আহমদ রফিক-----------------------------------------------------------৬৩**
 স্বাধীন স্বদেশে মাতৃভাষা-রাষ্ট্রভাষা নিয়ে কথা
**৬. যতীন সরকার-----------------------------------------------------------৬৮**
 মাতৃভাষা ও মানুষের মৌলিক পরিচয়
**৭. ড. রফিকুল ইসলাম-----------------------------------------------------৭৬**
 বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ
**৮. ড. মনসুর মুসা---------------------------------------------------------৮৫**
 বাংলা বানানের সমতা ও প্রামাণিকতার প্রশ্ন
**৯. ড. এমএ ইউসুফ খান---------------------------------------------------৯০**
 প্রবাসে নয়াপ্রজন্ম: মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি
**১০. মোনায়েম সরকার-------------------------------------------------------৯৩**
 প্রিয় বাংলা ভাষা চিরজীবী হোক
**১১. মোহাম্মদ আবদুল হাই--------------------------------------------------৯৮**
 বিশ্বায়নে বাংলা ভাষা পরিস্থিতি
**১২. শামীম আজাদ--------------------------------------------------------১০৮**
 বিলেতের ক্লাসরুমেই বাংলা
**১৩. অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান------------------------------------------১১১**
 সর্বস্তরে বাংলা ভাষা:শুদ্ধ বানানে শুদ্ধ উচ্চারণে
**১৩. অধ্যাপিকা বিলকিস খানম পাপড়ি--------------------------------------১১৫**
 আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্দোলন
**১৪. হায়দার রাহমান--------------------------------------------------------১১৯**
 বাংলা ভাষা-সাহিত্য পরিক্রমা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

# বায়ান্নর দিনগুলো

এদিকে জেলের ভেতর (ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার) আমরা দুইজনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম অনশন ধর্মঘট করার জন্য। আমরা আলোচনা করে ঠিক করেছি, যাই হোক না কেন, আমরা অনশন ভাঙব না। যদি এই পথেই মৃত্যু এসে থাকে, তবে তাই হবে। জেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে, সুপারিনটেনডেন্ট আমীর হোসেন সাহেব ও তখনকার দিনে রাজবন্দিদের ডেপুটি জেলার মোখলেসুর রহমান সাহেব আমাদের বুঝাতে অনেক চেষ্টা করলেন। আমরা তাঁদের বললাম, আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের বলবার কিছু নাই। আর আমরা সেজন্য অনশন করছি না। সরকার আমাদের বৎসরের পর বৎসর বিনাবিচারে আটক রাখছে, তারই প্রতিবাদ করার জন্য অনশন ধর্মঘট করছি। এতদিন জেল খাটলাম, আপনাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য হয় নাই। কারণ আমরা জানি যে, সরকারের হুকুমেই আপনাদের চলতে হয়।

১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সকালবেলা আমাকে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হলো এই কথা বলে যে, আমার সাথে আলোচনা আছে অনশন ধর্মঘটের ব্যাপার নিয়ে। আমি যখন জেলগেটে পৌঁছালাম দেখি, একটু পরে মহিউদ্দিনকেও নিয়ে আসা হয়েছে একই কথা বলে। কয়েক মিনিট পরে আমার মালপত্র, কাপড়চোপড় ও বিছানা নিয়ে জমাদার সাহেব হাজির। বললাম, ব্যাপার কী? কর্তৃপক্ষ বললেন, আপনাদের অন্য জেলে পাঠানোর হুকুম হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কোন জেলে? কেউ কিছু বলেন না। এদিকে আর্মড পুলিশ, আইবি অফিসারও প্রস্তুত হয়ে এসেছে। খবর চাপা থাকে



না। একজন আমাকে বলে দিল, ফরিদপুর জেলে। দুইজনকে এক জেলে পাঠানো হচ্ছে। তখন নয়টা বেজে গেছে। এগারোটায় নারায়ণগঞ্জ থেকে জাহাজ ছাড়ে, সেই জাহাজ আমাদের ধরতে হবে। আমি দেরি করতে শুরু করলাম, কারণ তাহলে কেউই জানবে না আমাদের কোথায় পাঠাচ্ছে। প্রথমে আমার বইগুলি এক এক করে মেলাতে শুরু করলাম, তারপর কাপড়গুলি। হিসাব-নিকাশ, কত টাকা খরচ হয়েছে, কত টাকা আছে। দেরি করতে করতে দশটা বাজিয়ে দিলাম। রওয়ানা করতে আরও আধাঘণ্টা লাগিয়ে দিলাম। আর্মড পুলিশের সুবেদার ও গোয়েন্দা কর্মচারীরা তাড়াতাড়ি করছিল। সুবেদার পাকিস্তান হওয়ার সময় গোপালগঞ্জে ছিল এবং সে একজন বেলুচি ভদ্রলোক। আমাকে খুবই ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করতো। আমাকে দেখেই বলে বসলো, ইয়ে কেয়া বাত হ্যায়, আপ জেলখান মে। আমি বললাম, কিসমত। আর কিছুই বললাম না। আমাদের জন্য ঘোড়ার গাড়ি আনা হয়েছে। গাড়ির ভেতর জানালা উঠিয়ে ও দরজার কপাট বন্ধ করে দিল। দুইজন ভেতরেই আমাদের সাথে বসলো। আর একটা গাড়িতে অন্যরা পেছনে পেছনে। ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে ট্যাক্সি পাওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। আমরা আস্তে আস্তে নামলাম ও উঠলাম। কোনো চেনা লোকের সাথে দেখা হলো না। যদিও এদিক-ওদিক অনেকবার তাকিয়েছিলাম। ট্যাক্সি তাড়াতাড়ি চালাতে বললো। আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, 'বেশি জোরে চালাবেন না, কারণ বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়।'

আমরা পৌঁছে খবর পেলাম জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। এখন উপায়? কোথায় আমাদের নিয়ে যাবে? রাত একটায় আর একটা জাহাজ ছাড়বে। আমাদের নারায়ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। উপরওয়ালাদের টেলিফোন করলো এবং হুকুম নিলো থানায়ই রাখতে। আমাদের পুলিশ ব্যারাকের একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো।

রাত এগারোটায় আমরা স্টেশনে আসলাম। জাহাজ ঘাটেই ছিল, আমরা উঠে পড়লাম। জাহাজ না ছাড়া পর্যন্ত সহকর্মীরা অপেক্ষা করলো। রাত একটার সময় সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বললাম, 'জীবনে আর দেখা না হতেও পারে। সকলে যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়। দুঃখ আমার নাই। একদিন মরতেই হবে, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি মরতে পারি, সে মরাতেও শান্তি আছে।'

জাহাজ ছেড়ে দিল, আমরা বিছানা করে শুয়ে পড়লাম। সকালে দুইজনে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, জাহাজে অনশন করি কী করে? আমাদের জেলে নিতে হবে অনশন শুরু করার পূর্বে। সমস্ত দিন জাহাজ চলল, রাতে গোয়ালন্দ ঘাটে এলাম। সেখান থেকে ট্রেনে রাত চারটায় ফরিদপুর পৌঁছলাম। রাতে আমাদের জেল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করলো না। আমরা দুইজনে জেল সিপাহীদের ব্যারাকের বারান্দায় কাটালাম। সকালবেলা সুবেদার সাহেবকে বললাম, 'জেল অফিসাররা না আসলে তো আমাদের জেলে নিবে না, চলেন কিছু নাশতা করে আসি।' নাশতা খাবার ইচ্ছা আমাদের নাই। তবে যদি কারও সাথে দেখা হয়ে যায়, তাহলে ফরিদপুরের

সহকর্মীরা জানতে পারবে, আমরা ফরিদপুর জেলে আছি এবং অনশন ধর্মঘট করছি। আধাঘণ্টা দেরি করলাম, কাউকেও দেখি না– চায়ের দোকানের মালিক এসেছে, তাকে আমি আমার নাম বললাম এবং খবর দিতে বললাম আমার সহকর্মীদের। আমরা জেলের দিকে রওয়ানা করছি, এমন সময় আওয়ামী লীগের এক কর্মী, তার নামও মহিউদ্দিন– সকলে মহি বলে ডাকে, তার সঙ্গে দেখা। আমি যখন ফরিদপুরে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ইলেকশনে ওয়ার্কার ইনচার্জ ছিলাম, তখন আমার কাজ করেছে। মহি সাইকেলে যাচ্ছিল, আমি তাকে দেখে ডাক দিলাম নাম ধরে, সে সাইকেল থেকে আমাকে দেখে এগিয়ে আসল। আইবি নিষেধ করছিল। আমি শুনলাম না, তাকে এক ধমক দিলাম এবং মহিকে বললাম, আমাদের ফরিদপুর জেলে এনেছে এবং আজ থেকে অনশন করছি সকলকে এ খবর দিতে।

আমরা জেলগেটে এসে দেখি, জেলার সাহেব, ডেপুটি জেলার সাহেব এসে গেছেন। আমাদের তাড়াতাড়ি ভেতরে নিয়ে যেতে বললেন। তাঁরা পূর্বেই খবর পেয়েছিলেন। জায়গাও ঠিক করে রেখেছেন, তবে রাজবন্দিদের সাথে নয়, অন্য জায়গায়। আমরা তাড়াতাড়ি ঔষধ খেলাম পেট পরিষ্কার করার জন্য। তারপর অনশন ধর্মঘট শুরু করলাম। দুইদিন পর অবস্থা খারাপ হলে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। আমাদের দুইজনেরই শরীর খারাপ। মহিউদ্দিন ভুগছে প্লুরিসিস রোগে, আর আমি ভুগছি নানা রোগে। চারদিন পরে আমাদের নাক দিয়ে জোর করে খাওয়াতে শুরু করল। মহাবিপদ! নাকের ভিতর দিয়ে নল পেটের মধ্য পর্যন্ত দেয়। তারপর নলের মুখে একটা কাপের মতো লাগিয়ে দেয়। একটা ছিদ্রও থাকে। সে কাপের মধ্যে দুধের মতো পাতলা করে খাবার তৈরি করে পেটের ভেতর ঢেলে দেয়। এদের কথা হলো, 'মরতে দেব না।'

আমার নাকে একটা ব্যারাম ছিল। দুই-তিনবার দেবার পরেই ঘা হয়ে গেছে। রক্ত আসে আর যন্ত্রণা পাই। আমরা আপত্তি করতে লাগলাম। জেল কর্তৃপক্ষ শুনছে না। খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমার দুইটা নাকের ভেতরই ঘা হয়ে গেছে। তারা হ্যান্ডকাফ পরানোর লোকজন নিয়ে আসে। বাধা দিলে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে জোর করে ধরে খাওয়াবে। আমাদের শরীরও খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। পাঁচ-ছয়দিন পরে বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আমরা ইচ্ছা করে কাগজি লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খেতাম। কারণ এর মধ্যে কোনো ফুড ভ্যালু নাই। আমাদের ওজনও কমতেছিল। নাকের মধ্য দিয়ে নল দিয়ে খাওয়ার সময় নলটা একটু এদিক-ওদিক হলেই আর উপায় থাকবে না। সিভিল সার্জন সাহেব, ডাক্তার সাহেব ও জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের কোনো অসুবিধা না হয়, তার চেষ্টা করছিলেন। বারবার সিভিল সার্জন সাহেব অনশন করতে নিষেধ করছিলেন। আমার ও মহিউদ্দিনের শরীর অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন আর বিছানা থেকে উঠবার শক্তি নাই। আমার হার্টের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে বুঝতে পারলাম। প্যালপিটিশন হয় ভীষণভাবে। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। ভাবলাম আর বেশিদিন নাই। একজন কয়েদিকে দিয়ে গোপনে কয়েক টুকরা কাগজ আনালাম। যদিও হাত কাঁপে, তথাপি ছোট ছোট করে



চারটা চিঠি লিখলাম। আব্বার কাছে একটা, রেণুর কাছে একটা, আর দুইটা শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবের কাছে। দু-একদিন পরে আর লেখার শক্তি থাকবে না।

একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটালাম, রাতে সিপাহিরা ডিউটিতে এসে খবর দিলো, ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে। কয়েকজন লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে। রেডিওর খবর। ফরিদপুরে হরতাল হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীরা শোভাযাত্রা করে জেলগেটে এসেছিল। তারা বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' আরও অনেক স্লোগান। আমার খুব খারাপ লাগল। কারণ, ফরিদপুর আমার জেলা, মহিউদ্দিনের নামে কোনো স্লোগান দিচ্ছে না কেন? শুধু 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' বললেই তো হতো। রাতে যখন ঢাকার খবর পেলাম, তখন ভীষণ চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম। কত লোক মারা গেছে বলা কষ্টকর। তবে অনেক লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে শুনেছি। দুজনে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে আছি। ডাক্তার সাহেব আমাদের নড়াচড়া করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু উত্তেজনায় উঠে বসলাম।

২২ তারিখে সারাদিন ফরিদপুরে শোভাযাত্রা চলল। কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী এক জায়গায় হলেই স্লোগান দেয়। ছোট্ট ছোট্ট ছেলে-মেয়ে রাস্তায় বেড়ায় আর স্লোগান দেয়। ২২ তারিখে খবরের কাগজ এল, কিছু কিছু খবর পেলাম। মুসলিম লীগ সরকার কত বড় অপরিণামদর্শিতার কাজ করল। মাতৃভাষা আন্দোলনে পৃথিবীতে এই প্রথম বাঙালিরাই রক্ত দিল। দুনিয়ার কোথাও ভাষা আন্দোলন করার জন্য গুলি করে হত্যা করা হয় নাই। জনাব নূরুল আমীন বুঝতে পারলেন না, আমলাতন্ত্র তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল। গুলি হলো মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের এরিয়ার ভেতরে, রাস্তায়ও নয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলেও গুলি না করে গ্রেফতার করলেই তো চলত। আমি ভাবলাম, দেখব কিনা জানি না, তবে রক্ত যখন আমাদের ছেলেরা দিয়েছে, তখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে আর উপায় নাই। মানুষের যখন পতন আসে, তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।

খবরের কাগজে দেখলাম, মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগিশ এমএলএ, খয়রাত হোসেন এমএলএ, খানসাহেব ওসমান আলী এমএলএ এবং মোহাম্মদ আবুল হোসেন ও খোন্দকার মোশতাক আহমদসহ শতশত ছাত্র ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। দু-একদিন পরে দেখলাম কয়েকজন প্রফেসর, মাওলানা ভাসানী, শামসুল হক সাহেব ও বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। নারায়ণগঞ্জে খানসাহেব ওসমান আলীর বাড়ির ভেতরে ঢুকে ভীষণ মারপিট করেছে। বৃদ্ধ খানসাহেব ও তাঁর ছেলে-মেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছে। সমস্ত ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। আওয়ামী লীগের কোনো কর্মীই বোধহয় আর জেলখানার বাইরে নাই।

আমাদের অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যে, যেকোনো মুহূর্তে মৃত্যুর শান্তি-ছায়ায় চিরদিনের জন্য স্থান পেতে পারি। সিভিল সার্জন সাহেব দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার আমাদের দেখতে আসেন। ২৫ তারিখ সকালে যখন আমাকে তিনি পরীক্ষা

করছিলেন হঠাৎ দেখলাম, তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। তিনি কোনো কথা না বলে, মুখ কালো করে বেরিয়ে গেলেন। আমি বুঝলাম, আমার দিন ফুরিয়ে গেছে। কিছু সময় পরে আবার ফিরে এসে বললেন, 'এভাবে মৃত্যুবরণ করে কি কোনো লাভ হবে? বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।' আমার কথা বলতে কষ্ট হয়, আস্তে আস্তে বললাম, 'অনেক লোক আছে। কাজ পড়ে থাকবে না। দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসি, তাদের জন্যই জীবন দিতে পারলাম, এই শান্তি।' ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন, 'কাউকে খবর দিতে হবে কি না? আপনার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী কোথায়? আপনার আব্বার কাছে কোনো টেলিগ্রাম করবেন?' বললাম, 'দরকার নাই। আর তাদের কষ্ট দিতে চাই না।' আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি, হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। হার্টের দুর্বলতা না থাকলে এতো তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়তাম না। একজন কয়েদি ছিল, আমার হাত-পায়ে সরিষার তেল গরম করে মালিশ করতে শুরু করল। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

মহিউদ্দিনের অবস্থাও ভালো না , কারণ প্লুরিসিস আবার আক্রমণ করে বসেছে। আমার চিঠি চারখানা একজন কর্মচারীকে ডেকে তাঁর কাছে দিয়ে বললাম, আমার মৃত্যুর পরে চিঠি চারখানা ফরিদপুরে আমার এক আত্মীয়ের কাছে পৌঁছে দিতে। তিনি কথা দিলেন, আমি তাঁর কাছ থেকে ওয়াদা নিলাম। বারবার আব্বা, মা, ভাই-বোনদের চেহারা ভেসে আসছিল আমার চোখের সামনে। রেণুর দশা কী হবে? তার তো কেউ নাই দুনিয়ায়। ছোট ছেলে-মেয়ে দুইটার অবস্থাই বা কী হবে? তবে আমার আব্বা ও ছোট ভাই এদের ফেলবে না, এ বিশ্বাস আমার ছিল। চিন্তাশক্তিও হারিয়ে ফেলছিলাম। হাচিনা, কামালকে একবার দেখতেও পারলাম না। বাড়ির কেউ খবর পায় নাই, পেলে নিশ্চয়ই আসত।

মহিউদ্দিন ও আমি পাশাপাশি দুইটা খাট পেতে নিয়েছিলাম। একজন আরেকজনের হাত ধরে শুয়ে থাকতাম। দুজনেই চুপচাপ পড়ে থাকি। আমার বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে। সিভিল সার্জন সাহেবের কোনো সময়-অসময় ছিল না। আসছেন, দেখছেন, চলে যাচ্ছেন। ২৭ তারিখ দিনের বেলা আমার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়লো। বোধহয় আর দু-একদিন বাঁচতে পারি।

২৭ তারিখ রাত আটটার সময় আমরা দুইজন চুপচাপ শুয়ে আছি। কারও সাথে কথা বলার ইচ্ছাও নাই, শক্তিও নাই। দুইজনেই শুয়ে শুয়ে কয়েদির সাহায্যে ওজু করে খোদার কাছে মাফ চেয়ে নিয়েছি। দরজা খুলে বাইরে থেকে ডেপুটি জেলার এসে আমার কাছে বসলেন এবং বললেন, 'আপনাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয়, তবে খাবেন তো?' বললাম, 'মুক্তি দিলে খাব, না দিলে খাব না। তবে আমার লাশ মুক্তি পেয়ে যাবে।' ডাক্তার সাহেব এবং আরও কয়েকজন কর্মচারী এসে গেছে, চেয়ে দেখলাম। ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন, 'আমি পড়ে শোনাই, আপনার মুক্তির অর্ডার এসে গেছে রেডিওগ্রামে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অফিস থেকেও অর্ডার এসেছে। দুইটা অর্ডার পেয়েছি।' তিনি পড়ে শোনালেন, আমি বিশ্বাস করতে চাইলাম না। মহিউদ্দিন শুয়ে শুয়ে অর্ডারটা দেখল এবং বলল যে, 'তোমার অর্ডার এসেছে।' আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ডেপুটি সাহেব বললেন,



'আমাকে অবিশ্বাস করার কিছুই নাই। কারণ, আমার কোনো স্বার্থ নাই; আপনার মুক্তির আদেশ সত্যিই এসেছে।' ডাক্তার সাহেব ডাবের পানি আনিয়েছে। মহিউদ্দিনকে দুইজন ধরে বসিয়ে দিলেন। সে আমাকে বলল, 'তোমাকে ডাবের পানি আমি খাইয়ে দিব।' দুই চামচ ডাবের পানি দিয়ে মহিউদ্দিন আমার অনশন ভাঙিয়ে দিল।

সকাল দশটার দিকে খবর পেলাম, আব্বা এসেছেন। জেল গেটে আমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসলেন। আমাকে দেখেই আব্বার চোখে পানি এসে গেছে। আব্বার সহ্যশক্তি খুব বেশি। কোনোমতে চোখের পানি মুছে ফেললেন। কাছে বসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমার মুক্তির আদেশ হয়েছে, তোমাকে আমি নিয়ে যাব বাড়িতে। আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম তোমার মা, রেণু, হাচিনা ও কামালকে নিয়ে, দুইদিন বসে রইলাম, কেউ খবর দেয় না তোমাকে কোথায় নিয়ে গেছে। তুমি ঢাকায় নাই একথা জেলগেট থেকে বলেছে। যদিও পরে খবর পেলাম, তুমি ফরিদপুর জেলে আছ। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ। নারায়ণগঞ্জ এসে যে জাহাজ ধরব তারও উপায় নেই। তোমার মা ও রেণুকে ঢাকায় রেখে তুমি চলে এসেছি। কারণ, আমার সন্দেহ হয়েছিল তোমাকে ফরিদপুর নেওয়া হয়েছে কিনা! আজই টেলিগ্রাম করব, তারা যেন বাড়িতে রওয়ানা হয়ে যায়। আমি আগামীকাল বা পরশু তোমাকে নিয়ে রওয়ানা করব, বাকি খোদা ভরসা। সিভিল সার্জন সাহেব বলেছেন, তোমাকে নিয়ে যেতে হলে লিখে দিতে হবে, 'আমার দায়িত্বে নিয়ে যাচ্ছি।' আব্বা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, তিনি খবর পেয়েছেন মহিউদ্দিনও মুক্তি পাবে, তবে একসাথে ছাড়বে না, একদিন পরে ছাড়বে।

পরেরদিন আব্বা আমাকে নিতে আসলেন। অনেক লোক জেলগেটে হাজির। আমাকে স্ট্রেচারে করে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হলো এবং গেটের বাইরে রেখে দিল, যদি কিছু হয় বাইরে গিয়ে হোক, এই তাদের ধারণা।

পাঁচদিন পর বাড়ি পৌঁছালাম। মাকে তো বুঝানো কষ্টকর। হাচু আমার গলা ধরে প্রথমেই বলল, 'আব্বা, রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই।' একুশে ফেব্রুয়ারি ওরা ঢাকায় ছিল, যা শুনেছে তাই বলে চলছে। কামাল আমার কাছে আসল না, তবে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি খুব দুর্বল, বিছানায় শুয়ে পড়লাম। গতকাল রেণু ও মা ঢাকা থেকে বাড়ি এসে আমার প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছিল। এক এক করে সকলে যখন আমার কামরা থেকে বিদায় নিল, তখন রেণু কেঁদে ফেলল এবং বলল, তোমার চিঠি পেয়ে আমি বুঝেছিলাম, তুমি কিছু একটা করে ফেলবা। আমি তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কাকে বলব নিয়ে যেতে, আব্বাকে বলতে পারি না লজ্জায়। নাসের ভাই বাড়ি নাই। যখন খবর পেলাম খবরের কাগজে, তখন লজ্জা শরম ত্যাগ করে আব্বাকে বললাম। আব্বা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাই রওয়ানা করলাম ঢাকায়, সোজা আমাদের বড় নৌকায় তিনজন মাল্লা নিয়ে। কেন তুমি অনশন করতে গিয়েছিলে? এদের কি দয়া-মায়া আছে? আমাদের কারও কথাও তোমার মনে ছিল না। কিছু একটা হলে কী উপায় হতো? আমি এই

দুইটা দুধের বাচ্চা নিয়ে কী করে বাঁচতাম? হাচিনা, কামালের অবস্থা কী হতো? কি বলবা, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট তো হতো না। মানুষ কি শুধু খাওয়া-পরা নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়? আর মরে গেলে দেশের কাজই-বা কীভাবে করতা?' আমি তাকে কিছুই বললাম না। তাকে বলতে দিলাম, কারণ মনের কথা প্রকাশ করতে পারলে ব্যথাটা কিছু কমে যায়। রেণু খুব চাপা, আজ যেন কথার বাঁধ ভেঙে গেছে। শুধু বললাম, 'উপায় ছিল না।' বাচ্চা দুইটা ঘুমিয়ে পড়েছে। শুয়ে পড়লাম। সাতাশ-আটাশ মাস পরে আমার সেই পুরানা জায়গায়, পুরানা কামরায়, পুরানা বিছানায় শুয়ে কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠের দিনগুলির কথা মনে পড়ল। ঢাকার খবর সবই পেয়েছিলাম। মহিউদ্দিনও মুক্তি পেয়েছে। আমি বাইরে এলাম আর আমার সহকর্মীরা আবার জেলে গিয়েছে।

পরের দিন সকালে আব্বা ডাক্তার আনালেন। সিভিল সার্জন সাহেবের প্রেসক্রিপশনও ছিল। ডাক্তার সকলকে বললেন, আমাকে যেন বিছানা থেকে উঠতে না দেওয়া হয়। দিনদশেক পরে আমাকে হাঁটতে হুকুম দিল শুধু বিকেলবেলা। আমাকে দেখতে রোজই অনেক লোক বাড়িতে আসত। গোপালগঞ্জ, খুলনা ও বরিশাল থেকেও আমার কিছুসংখ্যক সহকর্মী এসেছিল।

একদিন সকালে আমি ও রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম। হাচু ও কামাল নিচে খেলছিল। হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর 'আব্বা' 'আব্বা' বলে ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে। একসময় কামাল হাচিনাকে বলছে, 'হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি?' আমি আর রেণু দুজনেই শুনলাম। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, 'আমি তো তোমারও আব্বা' কামাল আমার কাছে আসতে চাইতো না। আজ গলা ধরে পড়ে রইল। বুঝতে পারলাম, এখন আর ও সহ্য করতে পারছে না। নিজের ছেলেও অনেকদিন না দেখলে ভুলে যায়। আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স মাত্র কয়েকমাস। রাজনৈতিক কারণে একজনকে বিনাবিচারে বন্দি করে রাখা আর তার আত্মীয়-স্বজন ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে দূরে রাখা যে কত বড় জঘন্য কাজ, তা কে বুঝবে? মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়। আজ দুইশত বৎসর পরে আমরা স্বাধীন হয়েছি। সামান্য হলেও কিছু আন্দোলনও করেছি স্বাধীনতার জন্য। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস, আজ আমাকে ও আমার সহকর্মীদের বছরের পর বছর জেল খাটতে হচ্ছে। আরও কতকাল খাটতে হয়, কেইবা জানে? একেই কি বলে স্বাধীনতা? ভয় আমি পাই না, আর মনও শক্ত হয়েছে।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় গুলি হওয়ার পরে গ্রামে গ্রামে জনসাধারণ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, যারা শাসন করছে তারা জনগণের আপনজন নয়। খবর নিয়ে জানতে পারলাম, একুশে ফেব্রুয়ারি গুলি হওয়ার খবর বাতাসের সাথে সাথে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেছে এবং ছোট ছোট হাট-বাজারে পর্যন্ত হরতাল হয়েছে। মানুষ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, বিশেষ একটা গোষ্ঠী (দল) বাঙালিদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চায়।



ভরসা হলো, আর দমাতে পারবে না। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে উপায় নাই। এই আন্দোলনে দেশের লোক সাড়া দিয়েছে ও এগিয়ে এসেছে। কোনো কোনো মাওলানা সাহেবেরা ফতোয়া দিয়েছিলেন বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে। তাঁরাও ভয় পেয়ে গেছেন। এখন আর প্রকাশ্যে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না। জনমত সৃষ্টি হয়েছে, জনমতের বিরুদ্ধে যেতে শোষকরাও ভয় পায়। শাসকরা যখন শোষক হয় অথবা শোষকদের সাহায্য করতে আরম্ভ করে, তখন দেশের ও জনগণের মঙ্গল হওয়ার চেয়ে অমঙ্গলই বেশি হয়।

শেখ হাসিনা

# ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছরপূর্তিতে মূল্যবান ভাষণ

'মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা....,

আমার ভাষা, মায়ের ভাষা, বাংলা ভাষা।

জন্মেই মাকে মা বলে ডাকি। মায়ের মুখের ভাষা থেকে বলতে শিখি, মনের কথা ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করি। যে ভাষায় আমি সব থেকে ভালো বুঝতে পারি, সে আমার মায়ের ভাষা। ভালবাসি ভালবাসি মাতৃভাষা ভালবাসি। সকল ভাষার সেরা ভাষা মাতৃভাষা মাতৃভাষা। ভালবাসি মাতৃভাষা প্রাণের ভাষা আমার ভাষা।

সকল জাতি, সকল সম্প্রদায় মায়ের ভাষাকে ভালবাসে। মায়ের ভাষা দিয়ে সব ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া, হাসি-কান্না হৃদয় জুড়ে সবটুকু বলা মায়ের ভাষায়। এর থেকে সুন্দর, এর থেকে মধুর আর কী হতে পারে?

মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার আদায় করতে রক্ত দিতে হয়েছিলো বাংলাদেশের মানুষকে। মা বলে ডাকার অধিকার আমাদের মুখ থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল; কিন্তু পারেনি। পারেনি কারণ এই ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য রক্ত ঝরাতে হয়েছে, বুকের রক্ত দিয়ে লিখে দিতে হয়েছে মায়ের ভাষায় মাকে মা বলে ডাকব। এ আমার প্রাণের অধিকার। এ আমার অস্তিত্বের অধিকার। আমার জাতিসত্তার



অধিকার। ২১ ফেব্রুয়ারি এমনি একটি রক্তঝরা দিন। ১৯৫২ সালে এই দিনে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ আরো কত নাম না জানা ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়ে লিখে গেলো 'ভালবাসি মাতৃভাষা'। সেই থেকে তো আমরা মাকে মা বলে পরাণ ভরে ডাকতে পারলাম।

এই বিশাল পৃথিবীর এককোণে বঙ্গোপসাগরের তীরে ছোট একটি ভূখণ্ডের মানুষ সেদিন কী সাহস দেখিয়েছে! মাতৃভাষাকে ভালবেসে রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে যে আত্মত্যাগ করেছে, সে কথা স্মরণ করে প্রতিবছর দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে বাংলার দেশপ্রেমিক সন্তানেরা বংশপরম্পরায়। শহিদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না, শহিদস্মৃতি অমর হোক। না, শহিদের রক্ত বৃথা যায়নি।

এই আত্মত্যাগের শিক্ষা নিয়েই তো ভালবেসেছি দেশকে। লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। পেয়েছি প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। আমার দেশ তোমার দেশ-বাংলাদেশ বাংলাদেশ।

শহিদের আত্মত্যাগের স্মৃতি আজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে গেছে, ছড়িয়ে গেছে বিশ্বময়। বিশ্বসভায় আজ মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবি স্বীকৃতির জন্যে। আর এ স্বীকৃতি বাঙালিই প্রথম বুকের রক্ত দিয়ে লিখে দিলো তার সাহসের কথা। বাঙালিই প্রথম দেখালো এ অর্জনের পথ।

২১ ফেব্রুয়ারি আজ আর শুধু আমাদের একার নয়। সমগ্র বিশ্ব আজ এ দিনটি স্মরণ করবে। ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করবে, স্মরণ করবে এই দিবসের অমর শহিদদের। আবিষ্ট হবে এই দিবসের তাৎপর্য শুনে, শুধু মায়ের ভাষাকে বাঁচাতে একটি জাতি কী অসীম ব্যাকুলতা নিয়ে গর্জে ওঠেছিলো এক স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে! বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর যখন ২১ ফেব্রুয়ারি পালিত হবে সকলে অনুপ্রেরণা পাবে, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখবে বাঙালি জাতি বীরের জাতি, ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে ঠিক যেমন রক্ত দিয়েছিল মেহনতি শ্রমিকদের শ্রমের মূল্য আদায় করতে ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরে। আমরা ১ মে শ্রমিক দিবসে আজো তাদের স্মরণ করি।

'ওরা আমার মুখে কথা কাইড়া নিতে চায় ...।'

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো দেশ স্বাধীন হয়। পাকিস্তান নামের দেশটির আবার দুটো খণ্ড। একটা পশ্চিম পাকিস্তান আর একটা পূর্ব পাকিস্তান। দুই ভূখণ্ডের মাঝে দূরত্ব ১২০০ মাইল। প্রায় ১৮৫২ কিলোমিটার। পূর্ব পাকিস্তান নামের অংশটির অধিবাসী বাংলা ভাষাভাষী, মূল ভূখণ্ডের নাম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মানুষের মুখের ভাষা বাংলা ভাষা।

পাকিস্তান নামের দেশটির এই পূর্ব খণ্ড অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান নামে প্রদত্ত বাংলার মানুষ তখন গোটা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৫ ভাগ বাঙালি।

বাংলার মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আবহাওয়া, জলবায়ু ভিন্ন। পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার জীবনাচরণ সবই আলাদা। শুধু একটাই মিল, তা হল ধর্ম। এই অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। শুধু ধর্মের নামে ১২০০ মাইল দূরের

দুটো ভূখণ্ড নিয়ে একটি দেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা। জন্মলগ্ন থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি বৈষম্যের শিকার হতো। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হয়। জন্মের পর ছয়মাস পার হবার আগেই শুরু হলো ষড়যন্ত্র। করাচিতে এক শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই শিক্ষা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। করাচির শিক্ষা সম্মেলনের খবর ঢাকায় পৌঁছার সাথে সাথে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর চিফ মিনিস্টার খাজা নাজিমুদ্দিনের বাড়ির সামনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ করে। পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে সে বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করা হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এটাই প্রথম বিক্ষোভ মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে। ছাত্ররা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে জিন্নাহর ছবি সরিয়ে ফেলে। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের (বর্তমান বাংলাদেশ ছাত্রলীগ) জন্ম হয়। মাতৃভাষার মর্যাদার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য ছাত্ররা আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং 'তমদ্দুন মজলিস' নামে অপর সংগঠন একত্রিত হয়, মাতৃভাষার দাবিতে আন্দোলন শুরু করার জন্য সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলে।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এক ফতোয়া দিলেন যে, উর্দুই হল ইসলামের ভাষা আর হিন্দুদের ভাষা হল বাংলা, কাজেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা একমাত্র উর্দুই হতে হবে।

অথচ পাকিস্তানে আরো অনেক প্রদেশ রয়েছে, ভাষা রয়েছে। পাঞ্জাব দুইখণ্ডে বিভক্ত, পাকিস্তানে এক অংশ আর ভারতে আরেক অংশ। উভয় খণ্ডে পাঞ্জাবি ভাষা হিন্দু-মুসলমান সকলেই ব্যবহার করে।

উর্দু কোনো জাতির মাতৃভাষা নয়। পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পশতু, বেলুচসহ আরো অনেক মাতৃভাষা পাকিস্তানে রয়েছে।

আর বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা। কিন্তু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করে মাতৃভাষার ওপর চরম আঘাত হানার চেষ্টা বাঙালিরা কোনোমতেই মেনে নিতে পারেনি। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাকেই যদি রাষ্ট্রভাষা করা হয়, তাহলে সমগ্র পাকিস্তানে বাংলাই হতো রাষ্ট্রভাষা। অথচ যে ভাষায় মাকে মা বলে ডাকি, যে ভাষায় কথা বলি, সে ভাষা কেড়ে নেয়ার এক নির্মম ষড়যন্ত্র শুরু হলো। এ ষড়যন্ত্র বাঙালিরা কোনোদিনই মেনে নিতে পারে না। মেনে নেবে না। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় বাঙালি বদ্ধপরিকর।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে ঘোষণা দেন যে, 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে'। বাংলার মানুষ এই ঘোষণায় বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে। খাজা নাজিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম লীগ সরকারের এই হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান অগ্রণী ভূমিকা নেন। ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের



সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। ২ মার্চ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের এক বৈঠক হয়। এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ফজলুল হক মুসলিম হলে। এই বৈঠকেই 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন হয়। এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন শেখ মুজিব।

সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ বাংলার জনগণকে মুসলিম লীগ সরকারের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ করার জন্য প্রচারাভিযান শুরু করে। বিভিন্ন অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণসংযোগ করতে থাকে।

১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। বাঙালির বিরুদ্ধে, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্তকে রুখে দাঁড়াবার জন্য এই ধর্মঘট। ১১ মার্চের ধর্মঘটের দিনে ছাত্ররা সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ঐ বিক্ষোভে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তার যেনো আগুনে ঘৃতাহুতি। বাংলাদেশের সমস্ত ছাত্র যখন জানতে পারে ঢাকায় ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বিক্ষোভে তারা রাস্তায় নামে। প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। আন্দোলনের চাপে ১৫ মার্চ বন্দিদের মুসলিম লীগ সরকার মুক্তি দেয়।

জনাব নাজিমুদ্দীন তখন পূর্ব পাকিস্তানের চিফ মিনিস্টার। তিনি সমঝোতার উদ্যোগ নেন। ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনা করেন ১৫ মার্চ। সংগ্রাম পরিষদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ঘোষণা দেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আইনসভায় প্রস্তাব পাস করা হবে যে, 'বাংলা ভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে'। এই ঘোষণার পর সকল ছাত্রবন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে এবং পুলিশের হামলার তদন্ত করা হবে। এই সমঝোতায় সকল বন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ সকল বন্দী মুক্তি পান ১৫ মার্চ সন্ধ্যায়।

১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রসভা হয় (আমতলা বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের দক্ষিণে নতুন এক্সটেনশন বিল্ডিংয়ে)। ১৬ মার্চের ভাষার দাবিতে যে সভা , সে সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। সকালে এই সভা শেষ হয়। ঐদিন বিকেলে আইনসভার অধিবেশন বসে। তখন সংসদ ভবন ছিল বর্তমান জগন্নাথ হল যে স্থানে সেখানে। সেখানে ছাত্ররা জমায়েত হয়; কিন্তু সেখানে আবার পুলিশ লাঠিচার্জ করে ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ছাত্ররা ক্ষেপে যায় নাজিমুদ্দীনের উপর এবং প্রতিবাদ জানায় এই অত্যাচারের। তারা নাজিমুদ্দীনের তদন্ত প্রস্তাব নাকচ করে দেয় এবং পুলিশ নির্যাতনের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে।

আমাদের সময়ে সকল আন্দোলনের পীঠস্থান যেমন ছিল বটতলা। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন-সংগ্রাম-মিটিংয়ের জায়গা ছিল আমতলা। বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বহির্বিভাগ যেখানে ঠিক সেই স্থানে।

সেই আমতলায় ১৬ মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ছাত্রসভার আয়োজন করা হয়। ছাত্রদের সাথে জনতাও এসে যোগদান করে। পুলিশ সেখানে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। বাধার মুখে শেখ মুজিবের সভাপতিত্বে জনসভা শুরু হলে পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস মেরে সভায় হামলা চালায়। সেই হামলার

প্রতিবাদে ১৭ মার্চ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করা হয়। আন্দোলনে নতুন গতি পায়।

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ঢাকায় এলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর এটা তার প্রথম সফর এই ভূখণ্ডে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে। তাকে বলা হতো 'কায়েদে আযম' অর্থাৎ পাকিস্তানের জাতির জনক। সেই পাকিস্তানের জাতির জনক পাকিস্তানের এই ভূখণ্ডে এলে তাকে বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়। জিন্নাহকে সংবর্ধনা দেবার জন্য তৎকালীন রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে এক সভা হয়। বিশাল জনসভা, প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জনগণ এসেছে কায়েদে আযম অর্থাৎ জাতির পিতাকে দেখতে, তার কথা শুনতে। কিন্তু সেই জনসভায় তিনি ঘোষণা দিলেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' আর তখনই ছাত্ররা জনসভার মধ্যেই প্রতিবাদ করলো। জনসভায় এই প্রতিবাদ শুনে তিনি একদম চুপ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বক্তৃতা বন্ধ করে রাখলেন। এ প্রসঙ্গে আর কোনো কথা বলেননি। এরপর তিনি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যাত্রা শুরু করেন। অবশ্য পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেখান থেকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং বন্দী করে রাখে যতক্ষণ সমাবর্তন শেষ না হয়। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রাভাষা হবে', এ কথা ইংরেজি ভাষায় পুনর্ব্যক্ত করার সাথে সাথে সমাবর্তনের উপস্থিত ছাত্ররা 'নো' 'নো' বলে প্রতিবাদ জানায়। ভাষার অধিকার আদায়ের আন্দোলন অব্যাহত রইলো। ১১ মার্চ এরপর থেকে 'ভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হতে থাকলো প্রতিবছর। তার এ ঘোষণায় সারা বাংলাদেশ বিক্ষোভে ফুঁসতে থাকে। বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো কয়েকজন ছাত্র।

১১ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্তি পান। মুসলিম লীগকে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করার জন্য ২৩ জুন গঠন করা হয় বাংলাদেশ আওয়ামী মুসলিম লীগ। 'আওয়ামী' শব্দের অর্থ 'জনগণ'। মুসলিম লীগকে সমাজের উঁচু শ্রেণির দল হিসেবে চিহ্নিত করে জনগণের সংগঠন হিসেবে জন্ম নিল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'। পরবর্তীতে এই দলকে অসাম্প্রদায়িক রূপ দেয়ার জন্য 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নাম দেয়া হয়। ভাষার দাবি এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি আদায়ের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করার সময় বঙ্গবন্ধু ১৯ এপ্রিল আবার গ্রেপ্তার হন। জুলাই মাসের শেষে তিনি মুক্তি পান।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে তখন অর্থনৈতিক সংকট এবং প্রচণ্ড খাদ্য ঘাটতি ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজমান অথচ মুসলিম লীগ সরকারের সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। দেশের এই বিরাজমান খাদ্য ঘাটতির বিরুদ্ধে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন চলাকালীন ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। বঙ্গবন্ধু ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন। ফলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তিনি মুক্তি পান।



১১ অক্টোবর নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় নূরুল আমীনের পদত্যাগ দাবি করে প্রস্তাব করা হয়। আন্দোলনকে আরো বেগবান করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়।

খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করে বলে খাদ্যের দাবিতে আর্মানিটোলা ময়দানে জনসভা ও ভূখা মিছিল বের করে আওয়ামী মুসলিম লীগ। এই মিছিল থেকে ১৪ অক্টোবর মাওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুসহ অন্য নেতারা গ্রেপ্তার হন। পরে শুধু বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর ঘাতকের হাতে নিহত হন। খাজা নাজিমুদ্দীন রাষ্ট্রপ্রধান হন। পূর্ব-পাকিস্তানের নেতাদের গ্রেপ্তার করে বিক্ষোভ দমাতে পেরে খাজা নাজিমুদ্দীন পুরস্কৃত হন। ২৫ জানুয়ারি, ১৯৫২ রাষ্ট্রপ্রধান হয়েই তিনি ঘোষণা দিলেন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। এ ঘোষণায় মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে জেলখানা থেকে বঙ্গবন্ধু যোগাযোগ করলেন। জেলে তখন বন্দী শেখ মুজিব। ঢাকা মেডিকেল কলেজে বন্দী অবস্থায় চিকিৎসার জন্য তাকে আনা হয় যখন, তখন এই ঘোষণা হয়। মেডিকেল কলেজে অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ ও পরামর্শ করার সুযোগ পান। গভীর রাতে গোপনে মিটিং হয়। আন্দোলনকে জোরদার করার পরিকল্পনা নেয়া হয়।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা ও বন্দী মুক্তির দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি 'দাবি দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। ৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু অনশন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মহিউদ্দিন আহমদ তার সঙ্গী হলেন।

যেহেতু ঢাকায় থাকলে ছাত্রদের সঙ্গে এবং নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ পান, তাই তাকে ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। ঢাকা থেকে ফরিদপুর যেতে হলে স্টিমারে যেতে হতো, স্টিমার ছাড়তো নারায়ণগঞ্জ থেকে। নারায়ণগঞ্জ স্টিমারঘাটে অনেক নেতা অপেক্ষা করতে থাকেন তাঁর সাথে দেখা করার জন্য। সেখানেও তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচি সফল করার নির্দেশ দেন। সকলকে কাজ করার জন্য নেমে পড়তে বলেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি অনশন শুরু করেন এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। সেখানে বসেই তিনি সিদ্ধান্ত ছিলেন ১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে যোগাযোগ রাখার দায়ে বঙ্গবন্ধুকে অনশনরত অবস্থায় ফরিদপুর জেলে প্রেরণ করা হল।

২১ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টায় ছাত্রদের মিছিলের ওপর মুসলিম লীগ সরকার গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার লুটিয়ে পড়লো কালো পিচঢালা পথে। তারা রক্তের অক্ষরে মায়ের ভাষায় মাকে মা বলে ডাকার দাবি জানিয়ে গেলো। সেই থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি প্রতিবছর 'শহিদ দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

আমি ও কামাল খুব ছোট্ট। আব্বা প্রায় আড়াইবছর ধরে বন্দী, তারপরও খুব অসুস্থ অবস্থায় অনশন করছেন। দাদা এ খবর পেয়ে আমাদের নিয়ে ঢাকায় রওনা হলেন নৌকায় করে। বেশ বড় নৌকায় আমরা দুই ভাই-বোন হেঁটে চলে বেড়াতে পারি। দুইখানা কামরা নৌকায়। টুঙ্গীপাড়া থেকে রওনা হয়ে পদ্মা, মেঘনা,

আড়িয়াল খাঁ পাড়ি দিয়ে চারদিনে ঢাকা এসে পৌঁছেছি। তিন মাল্লার নৌকা, তাই বেশ তাড়াতাড়ি এসেছি। আজিমপুর কলোনিতে আমার দাদার ছোট ভাই থাকতেন তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে, আমরা সেখানে ওঠলাম। ২১ ফেব্রুয়ারির দিন আমি তখন ঢাকায় ছিলাম, তবে এতো ছোট্ট ছিলাম যে, সব স্মৃতি এখন মনে নেই। রাতে কারফিউ, সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট ডেকেছে। আজিমপুর কলোনিতে এসে মুখে চোঙা লাগিয়ে কেউ যাতে অফিসে না যায়, তার জন্য আহ্বান করতো, আর সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এসে ধাওয়া করতো। ঘরের ভেতর একরকম বন্দী থাকতে হয়েছে। পরের দিন আব্বার খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেলো তাঁকে ফরিদপুর জেলে নিয়ে গেছে। দাদা স্টিমারে মা, দাদি, কামাল ও আমাকে দেশের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। আর দাদা গেলেন ফরিদপুরে। আব্বাকে ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে মুক্তি দেয়া হয়। অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় দাদা আব্বাকে বাড়ি নিয়ে এলেন। দীর্ঘদিন অনশনে থেকে শরীরের যে ক্ষতি হয়েছিলো, তা সারিয়ে তুলতে তিনমাস সময় লেগেছিলো। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ঢাকায় আসেন।

১৯৪৮ সাল থেকে যে আন্দোলন শুরু ১৯৫২ সালে এসে সেই আন্দোলন সফলতা অর্জন করে। ভাষা আন্দোলনে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের অবদানই সব থেকে বেশি। প্রগতিশীল ছাত্রসমাজও এ আন্দোলনে যথেষ্ট অবদান রাখে। আজ যদি বাংলার মানুষের ভাষা আন্দোলন না হতো, আমরা মাতৃভাষায় কথা বলতে পারতাম না।



১৯৫৪ সালে নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হক, আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট নৌকা মার্কা নিয়ে নির্বাচন করে জয়ী হয়। ১৯৫৫ সালে নতুন কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠিত হয়। সেখানে আওয়ামী লীগের ১২ সদস্য নতুন শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করার জন্য সংসদে সংগ্রাম শুরু করে এবং চাপ অব্যাহত রাখে। ফলে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে উর্দু ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হলেও বারবার ষড়যন্ত্র হতে থাকে এবং স্থায়ী সরকার গঠন হতে পারে না, ভাঙাগড়ার খেলা চলতেই থাকে। ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হন। শেখ মুজিব তখন মন্ত্রী হন।

আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেই ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'শহিদ দিবস' হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং ঐদিন 'সরকারি ছুটির দিন' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেই থেকে আজও ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন হিসেবে বাংলার মানুষ পালন করে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার শহিদ মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে । প্রকল্প গ্রহণ করে বাজেটে টাকা ধার্য করে। শহিদ মিনার নির্মাণ কাজ শুরু করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, বাংলার মানুষের কপালে কোনো সুখ স্থায়ী হয় না।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে মার্শাল' ল জারি হয়। জনগণের নির্বাচিত সরকার উৎখাত হয় এবং নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। শহিদ মিনারের কাজ বন্ধ হয়ে

ভাষার প্রতি ভালোবাসা ❐ ২৭

যায়। ২১ ফেব্রুয়ারি ছুটির দিন বাতিল করে দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। আবার দীর্ঘ আন্দোলন ৬ দফা, ১১ দফা, ১৯৭০-এ নির্বাচন, ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন, স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদা লাভ- সবই রক্তের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয়েছে। তারপরও কি ষড়যন্ত্র থেমে থেকেছে? ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারিভাবে শহিদ দিবস পালন করে।

১৯৭৫ সালে ঘাতকের দল জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা, সামরিক শাসন জারি, একটার পর একটা সামরিক ক্যু, রক্তপাত, ভোটের অধিকার হরণ, গণতন্ত্র নির্বাসন।

আবার সংগ্রাম, আন্দোলন, রক্তদান গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে বিজয় অর্জন করে জনগণের ভোটে আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

মহান ভাষা আন্দোলনে যে অবদান বাঙালি জাতি রেখেছিলো, তা আজ সমগ্র বিশ্ব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। এ আমাদের গৌরবের অহঙ্কারের দিন। এদিন হৃদয়ে ঝরে রক্তক্ষরণের বেদনা, চোখে ভাসে অশ্রুধারা। মুখে আমাদের গর্বের হাসি। এ এক অদ্ভুত আনন্দ-বেদনা আর গর্বে ভরা বিচিত্র অনুভূতি, যে অনুভূতি শুধু বাংলার সীমানায় আবদ্ধ নয়, আজ বিশ্বব্যাপী ব্যাপৃত।



২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের মহৎ অর্জন। এই অর্জনের পেছনে রয়েছে কত আত্মত্যাগ। অনেক অত্যাচার নির্যাতন স্বীকার করে রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি ভাষার মর্যাদা। আর এই ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই পেয়েছি স্বাধীনতা।

কানাডায় প্রবাসী কয়েকজন বাঙালি এবং কিছু বিদেশি মিলে 'মাতৃভাষার প্রেমিকগোষ্ঠী' নামে একটি সংগঠন করে। এই সংগঠন প্রথম জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' নামে একটি ঘোষণার প্রস্তাব পাঠায়। চিঠির উত্তরে মহাসচিব জানান, কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত কোনো দেশের কাছ থেকে প্রস্তাব এলে তারা বিবেচনা করতে পারে।

কানাডা থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি জানানো হয়। ১৯৯৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর আমাকে ফোনে শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি জানান এবং প্রস্তাব পাঠাতে পারি কি না তা জানতে চান। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব পাঠাতে বলি। প্রস্তাবে ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে বাঙালির আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করা এবং ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের কথা উল্লেখ করা হয়। ১০ সেপ্টেম্বর ছিল প্রস্তাব পাঠাবার শেষ দিন। কাজেই অতি দ্রুত শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই প্রস্তাব ইউনেস্কোতে প্রেরণ করে।

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালিত হয় আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিক বিদ্রোহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। শ্রমিকরা শ্রমের মূল্য আদায়ের জন্য জীবন দান করেছিলো। সারাবিশ্ব সে দিবসটি পালন করে। শিক্ষামন্ত্রীকে এ বিষয়টি উল্লেখ করার কথাও বলি। ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সদস্যপদ প্রাপ্তির ২৫ বছরপূর্তি

ভাষার প্রতি ভালোবাসা ❐ ২৮

উপলক্ষে নিউইয়র্ক যাই। জাতিসংঘে রজতজয়ন্তী উদযাপন করি। জাতিসংঘের মহাসচিব এবং অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধানদের সাক্ষাৎ হয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনও উপস্থিত ছিলেন। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং মহাসচিবের দেয়া মধ্যাহ্নভোজে শরিক হই।

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রধানদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাঙালি জাতির অবদানের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরি। মাতৃভাষাকে আমরা কত ভালবাসি তা গর্ব করে উল্লেখ করি।

নিউইয়র্ক থেকে আমি প্যারিস যাই ইউনেস্কো কর্তৃক 'শান্তি পুরস্কার' গ্রহণের জন্য। ২৪ সেপ্টেম্বর আমাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। ইউনেস্কোর প্রধানের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বিষয়ে আলোচনা করি। ২১ ফেব্রুয়ারির কথাও উল্লেখ করি।

ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে সর্বসম্মতিভাবে ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ও কর্মকর্তারা এবং প্যারিসের রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের কর্মকর্তা যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। ১৭ নভেম্বর এ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পৃথিবীতে অসংখ্য জাতি। ছয় হাজারের বেশি মাতৃভাষা রয়েছে। সঠিক সংখ্যাটি এখনো জানা যায়নি। অনেক ভাষা হারিয়ে গেছে। জীবন-জীবিকার খোঁজে মানুষ তার সুবিধামতো অবস্থান নেয় বা নিতে বাধ্য হয়। ফলে সহজে যোগাযোগের মাধ্যম খুঁজে নেয়। আর তাই হারিয়ে যায় মাতৃভাষা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা হওয়াতে আর মাতৃভাষা হারিয়ে যাবে না, অন্তত অস্তিত্ব খুঁজে বের করা যাবে। সংরক্ষণ করা হবে, গবেষণা করা হবে।

বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা।

অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি ছেলে-মেয়েদের নিজের ভাষা না শিখিয়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ইংরেজি অবশ্যই শিখবে, ইংরেজি ও আরবি– এই দুটো ভাষা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন, বিশেষ করে জীবন-জীবিকার জন্য এ দুটো ভাষার প্রয়োগ জানতে হবে। পাশাপাশি অন্য ভাষাও শিখতে পারি; কিন্তু তা অবশ্যই মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে নয়।

ঢাকা শহরে গুলশান, বারিধারা, বনানীতে ইদানীং দেখা যায় ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল। বাংলা শিক্ষা একেবারেই দেয়া হয় না। প্রতিটি স্কুলে মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হবে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। আর একটি বিষয় আমাকে খুবই পীড়া দেয়। সেটা হলো ইংরেজি একসেন্টে বাংলা বলা।

অর্থশালী, সম্পদশালী পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এই প্রবণতা একটু বেশি দেখা যাচ্ছে। আর যদি পয়সাওয়ালা হয়, তা হলে তো কথাই নেই। মনে হয়, বাংলা বলতে যেনো খুবই কষ্ট হচ্ছে।

এ প্রবণতা কেন? নিজেদের দৈন্য ঢাকার জন্য? নাকি যেখানে মৌলিকত্বের অভাব সেখানে শূন্যতা ঢাকার প্রচেষ্টা? অভিভাবক, শিক্ষক, বিশেষ করে পিতা-



মাতাকে এ বিষয়ে নজর দিতে হবে। বিদেশে বসবাসরত পরিবারগুলো ঘরে বসে বাচ্চাদের সাথে ইংরেজি বলেন। ফলে বাচ্চাদের মাতৃভাষা শেখার আর কোনো সুযোগই থাকে না। দিনের অধিকাংশ সময় বাচ্চারা স্কুলে কাটায়। কাজেই যে দেশে থাকে বা যে ভাষায় শিক্ষা নেয়, সে ভাষা সহজেই নেয়। ঘরে এসে যদি মাতৃভাষায় কথা না বলা হয়, তাহলে তো মাতৃভাষা শিখবেই না।

বাচ্চাদের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তাদের শিখিয়ে দিলেই হয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে মাতৃভাষা ব্যবহার করাই প্রয়োজন। বাচ্চারা ভাষা খুবই তাড়াতাড়ি রপ্ত করতে পারে। এমনকি একইসঙ্গে অনেক ভাষা তারা শিখে ফেলে। ওদের কিন্তু তেমন অসুবিধা হয় না।

আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা। ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি। স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছি। রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় প্রথম ভাষণ দিয়েছিলেন ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। বিশ্বসভায় বাংলা ভাষা মর্যাদা পেয়েছিলো। বাংলা ভাষার কাব্য রচনা করেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। পৃথিবীতে যত ভাষাভাষী রয়েছে, বাঙালি জনসংখ্যার দিক দিয়ে সপ্তম স্থান অধিকার করে আছে। কাজেই আমাদের ভাষা অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী। আমাদের ভাষার চর্চা বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশে আমরা মাতৃভাষাচর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করবো। এই গবেষণা কেন্দ্রে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষা সংগ্রহ করা হবে। মাতৃভাষা উৎকর্ষ সাধনে গবেষণা করা হবে। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা রাখা হবে। বাংলাদেশের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। পৃথিবীর একশত অষ্টাশিটা (১৮৮) দেশ এখন থেকে মাতৃভাষা দিবস পালন করবে। এই দিবস পালনকালে বাংলাদেশের ভাষা শহিদ রফিক, জব্বার, বরকত, শফিউর, সালামের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ আজ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। আমাদের সকলের দায়িত্ব বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধনে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গ্রহণ করা। ২০২০ সালে বাংলাদেশ শিক্ষায়-দীক্ষায়, জ্ঞানগরিমায় উন্নত হবে। অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করে ক্ষুধামুক্ত, শোষণমুক্ত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে উঠবে।

আমাদের আরো যত্নবান হতে হবে আমাদের ভাষাকে বিকশিত করার জন্য, চর্চা করার জন্য। মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করে যত সুন্দর সহজভাবে বিষয়টি আমরা বুঝতে পারি, অন্য কোনো বিজাতীয় ভাষায় কি তা আমরা বুঝতে পারি? শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে বাংলাচর্চা করতে হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনে অন্য ভাষাও শিখতে হবে।

তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে ছোট হয়ে আসছে বিশ্ব; তাই মানুষে মানুষে যোগাযোগও বেড়েছে। জীবন-জীবিকার অন্বেষণে মানুষ ছুটে যাচ্ছে দেশে-বিদেশে। তাই মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্য ভাষার প্রয়োজন আমরা স্বীকার করি, তার প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে; কিন্তু তা মাতৃভাষাকে ভুলে নয়। রক্তে কেনা আমাদের মাতৃভাষা,

এ ভাষা চর্চার জন্য আমাদের সকলকে যত্নবান হতে হবে। আন্তরিক হতে হবে। বিশ্বস্বীকৃতি পাওয়ার পর আমাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। যে মর্যাদা আজ বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ পেয়েছে, সে মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাতে হবে।

ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছরপূর্তি উপলক্ষে স্মরণ করি সকল শহিদকে। শ্রদ্ধা জানাই তাদের প্রতি। শহিদের রক্ত বৃথা যায় না আজ তা প্রমাণিত। অনেক রক্ত দিয়ে আমরা মহত্ত্ব অর্জন করেছি। আজ দল-মত নির্বিশেষে সকলের দায়িত্ব এ মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা।



মোস্তফা জব্বার

# বাংলা ভাষার সোনালি সময়

বাংলা ভাষা নিয়ে আপনি কি বিব্রত বোধ করেন? কোনো বিদেশির সামনে কথা বলতে গিয়ে ইংরেজি ঠিকমতো বলতে পারেন না বলে আপনি ছোট হয়ে যাবেন বলে মনে হয়? কেবল বাংলা নয়, ইংরেজি ছাড়া দুনিয়ার সকল মাতৃভাষাভাষী মানুষের মাঝেই এমন বোধ কাজ করতেই পারে। তবে সময়টা এখন দিন বদলের। এখন সময় হয়েছে যে, আপনি বাংলায় কথা বলবেন এবং অন্য একজন তার ভাষায় তিনি সেটি শুনবেন বা বুঝবেন। অন্যদিকে ইংরেজি হোক বা অন্য ভাষাতেই হোক কেউ কিছু প্রকাশ করছে, সেটি আপনি বাংলাতেই জানবেন। খোদ ইংরজির রাজধানী বিবিসিই আশঙ্কা করছে যে, ইংরেজি ভাষাটির একচেটিয়া আধিপত্য আর থাকছে না। সুখবর হচ্ছে যে, প্রযুক্তির জন্য বিশ্বভাষার এই পতন এবং মাতৃভাষাসমূহের উত্থান ঘটছে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষার জন্যও আমরা সেই প্রযুক্তি উন্নয়ন করছি।

বিবিসি প্রশ্ন তুলেছে, ইংরেজি কি জনপ্রিয় ভাষা হিসেবে টিকে থাকবে? এমন শিরোনামেই বিবিসি বাংলা ডট.কম ২ মে ২০১৮ একটি ছোট খবর প্রকাশ করে। বিশ্বজুড়ে যারা ইংরেজি ভাষার প্রেমিক, তাদের সামনে এই খবরটি খুব ছোট করে একটি প্রশ্ন তুলে ধরেছে যে, ইংরেজি কি তার বিশ্বভাষার স্থানটি আগামীতে নিজের দখলে রাখতে পারবে না? আমরা যারা বাংলা ভাষাভাষী হয়েও ইংরজির জন্য মাত করি; তাদের জন্য এটি একটি বিশাল প্রশ্ন। যারা কথায় কথায় এমন উদাহরণ দেন যে, ইংরেজি না জানলে বিশ্বে টিকে থাকা যাবে না, তাদের জন্যও খবরটি প্রশ্নবোধক। খবরটি এরকম: ‘বিশ্বজুড়ে শত কোটি মানুষ ইংরেজি ভাষায় কথা

বলেন; কিন্তু অনুবাদ প্রযুক্তির উন্নতি এবং হাইব্রিড ভাষার বা ভাষার মিশ্রণের কারণে এর মর্যাদা কি এখন হুমকিতে?' এরপরই খবরটিতে বলা হয় যে, 'যদি প্রশ্ন করা হয়, কোন দেশ সবচেয়ে বেশি ইংরেজিভাষীদের উৎসাহ যোগাচ্ছে? কিংবা কোন দেশে মানুষ সবচেয়ে বেশি ইংরেজি ভাষা শিখছে? উত্তর হচ্ছে চীন।' তবে বাস্তবতা হলো, আগামীতে হাজারবছর চেষ্টা করেও চীনাদের মাতৃভাষা বদলানো যাবে না। কিছু চীনা ব্যবসায়ী ইংরেজি শিখছে–তবে সেই দেশটির সাধারণ মানুষের কাছে ইংরেজির কোনো প্রভাব নেই। বরং এমনও হতে পারে যে, আজ যেসব চীনা এখন নতুন করে ইংরেজি শেখার কথা ভাবছে, পাঁচবছরে তারা নিজের মায়ের ভাষার কোলেই ফিরে আসবে। এখনতো এমন প্রযুক্তির সময় হয়েছে যখন চীনারা ইংরেজি বুঝবে প্রযুক্তি দিয়ে, আর চীনাদের ইংরেজি বুঝতে হবে না এবং চীনা ভাষা ইংরেজিসহ বিশ্বের অন্য ভাষাতেও মানুষ বুঝতে পারবে।

বিবিসির খবরটিতে এরপর বলা হয়, 'ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেসের প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, সেখানে প্রায় ৩৫ কোটি (৩৫০ মিলিয়ন) মানুষের ইংরেজিতে অন্তত কিছু না কিছ জ্ঞান রয়েছে এবং এরকম আরও কমপক্ষে দশ কোটি (১০০ মিলিয়ন) রয়েছে ভারতে।

সম্ভবত চীনে আরও অনেক মানুষ রয়েছে, যারা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইংরেজিতে কথা বলে। যেখানে আমেরিকানরা তাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে এটি ব্যবহার করে, সেখানেও প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন আমেরিকান নিজেদের বাড়িতে ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ভাষায় কথা বলে। কিন্তু ইংরেজি ভাষাটি আর কতদিন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ভাষা হিসেবে বিবেচিত হতে যাচ্ছে?

দি ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের তথ্য অনুসারে বিশ্বজুড়ে আনুমানিক ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন মানুষ এই ভাষায় কথা বলে; কিন্তু ৪০ কোটির কম মানুষের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ এটি।'

খবরটির মাঝে থাকা তথ্যাদি অনুসারে চীনের ইংরেজি শেখার প্রবণতা, ভারতের ইংরেজি প্রীতি বা বাংলাদেশের ইংরেজির জন্য জীবন দেবার এই প্রবণতার সময়েও যেমন আমেরিকার শতকরা ২০ জন নিজ ঘরে অন্য ভাষায় কথা বলে; তেমনি জাপান, কোরিয়া, জার্মান, ফ্রান্স, স্পেন বস্তুত ইংরেজি বর্জন করে কেবল নিজের ভাষাতেই সামনে এগিয়ে এসেছে। তবে তাদের এজন্য মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। দোভাষী নিয়ে তাদের ঘরে-বাইরে ঘুরতে হয়েছে।

খবরটিতে প্রশ্ন তোলা হয়, দোভাষী কিংবা অনুবাদকদের কি সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ আছে? এর জবাব কে কীভাবে কেমন করে দেবেন, তা আমি জানি না। কিন্তু আগামীতে মানুষকে এই দোভাষীর ভূমিকা পালন করতে হবে না। যন্ত্র বা প্রযুক্তি দোভাষীর কাজটা করে দেবে স্বাচ্ছন্দ্যে। আর প্রযুক্তির প্রভাবে বদলে যাবে বিশ্বের ভাষার মানচিত্রটা।

বিবিসি বাংলার খবরে আরও বলা হয়, 'ইংরেজি হলো বিশ্বের ফেভারিট লিঙ্গুয়া ফ্যাঙ্ক– অর্থাৎ যখন দুই দেশের দুই ভাষার মানুষকে এর উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন কোনো চীনা নাগরিক একজন ফরাসি নাগরিকের সাথে আলাপে দুজনই



তাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতে না পেরে তখন নির্ভর করে ইংরেজি ভাষার ওপরই। বছর পাঁচেক আগেও সম্ভবত সেটাই ঘটতো; কিন্তু এখন আর নয়।

সেজন্য ধন্যবাদ দিতে হবে কম্পিউটারে অনুবাদ এবং কণ্ঠ শনাক্তকরণ প্রযুক্তিকে। এর ফলে এখন দুই দেশের দুজন নাগরিক নিজ নিজ দেশের ভাষাতেই কথা বলতে পারছেন এবং একে অন্যের সংলাপ মেশিনের অনুবাদের মাধ্যমে শুনতে পারছেন।

সুতরাং বিশ্বের শীর্ষ ভাষা হিসেবে ইংরেজির দিন সম্ভবত ফুরিয়ে এসেছে। এখন অনলাইনে ইংরেজিতে লেখা যে কোনো আর্টিকেল কম্পিউটার কিংবা ট্যাবলেটে কয়েকটি মাত্র ক্লিকেই জার্মান কিংবা জাপানিজে রূপান্তর করে পড়া সম্ভব। তাই যেখানে কম্পিউটারই সব গুরুদায়িত্ব নিজের ওপর নিয়ে নিচ্ছে, সেখানে আর ইংরেজি শিখতে তোড়জোড় কেন?'

না আমি বলছি না কালকেই ইংরেজি শেখার বিদ্যমান তোড়জোড় বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের দেশে তো এই প্রবণতা আরও বহুদিন অব্যাহত থাকবে। বাড়তেও থাকবে। তবে প্রযুক্তি যে বিশ্বের ভাষা ব্যবহারের আদলটাই বদলে দেবে, সেটি আমরা বেশ আগেই উপলব্ধি করেছি। তবে বাংলা ভাষার জন্য রক্ত দিয়ে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারী জাতি হিসেবে আমরা এ বিষয়ে তেমন সচেতন ছিলাম না। বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলা ভাষা কম্পিউটারে লেখার প্রযুক্তি উদ্ভাবন ছাড়া এই ভাষার প্রযুক্তিগত উন্নয়নে আমরা তেমন কোনো বড় কাজ অতীতে করিনি। এটি সত্য যে, বাংলা ভাষা প্রযুক্তিতে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা আমাদের নেই। তবে প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে পারাটাই বড় কথা নয়। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে কেবল ডিজিটাল যন্ত্রে বাংলা লিখতে পারাটাই এই ভাষার একমাত্র সফলতা হতে পারে না। বরং বড় বিষয় হচ্ছে যে, আমরা বাংলাকে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর ভাষার সমকক্ষ করে তুলতে পারিনি। প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা ব্যবহারে কি নেই আমাদের, সেটির তালিকায় কেবল লিখতে পারার ব্যাপারটা ছাড়া বাকি সবই রয়ে গেছে। আমরা যদি বিবিসির খবরটিকে মাথায় রাখি, তবে এটি স্পষ্ট করেই বাংলা ভাষার প্রযুক্তিগত অন্যান্য সক্ষমতাও অর্জন করতে হবে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, বানান বা ব্যাকরণ পরীক্ষা করা থেকে শুরু করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন বাংলার ব্যবহারের কোনোটি আমরা করতে পারিনি।

তবে ধারণা করি, সেই দিনটির শেষ প্রান্তে আমরা। একটি নতুন সোনালি সময় সামনে রয়েছে বাংলার। প্রায় ৩০ বছরের বেশি সময় তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলার জগতে বসবাস করে আজ যেন সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে আমি ভালো দেখতে পাচ্ছি।

আমরা আজ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দেশে জননেত্রী শেখ হাসিনার শাসনকালে বাংলা ভাষার একটি সোনালি সময় আনতে সক্ষম হতে যাচ্ছি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বলে এই ভাষা সচরাচর রাজ-রাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে ছিল। কোনো কোনো রাজা-বাদশা বাংলা সাহিত্যকে কিছুটা পৃষ্ঠপোষকতা দিলেও এর বর্ণমালা ও প্রযুক্তিগত বিষয় কচুরিপানার মতো ভাসতে ভাসতে সামনে এগিয়েছে। পাকিস্তান আমলের বাংলা টাইপরাইটার প্রকল্প, বাংলাদেশ আমলে

টাইপরাইটারের বৈদ্যুতিকীকরণ প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন ও এটুআই-এর ফ্রন্ট প্রকল্প, আরডিআরসির ব্র্যাক প্রকল্প, এটুআই-এর ইউনাইটেড বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পিঁপীলিকা ও অন্যান্য প্রকল্প ও আইসিটি ডিভিশনের বঙ্গ ওসিআর প্রকল্প বাংলার প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন করতে পারিনি। বস্তুত ডিজিটাল যন্ত্রে বাংলা লেখার উপায় উদ্ভাবন করা ছাড়া আমাদের যা যা করণীয় হতে পারতো, তার কোনোটাই আমরা সফলভাবে করতে সক্ষম হইনি। উল্লেখিত উদ্যোগগুলো কেন সফল হয়নি, তা নিয়ে আলোচনা না করেও আমি এটি বলতে পারি যে, বাংলা ভাষা সেই পৃষ্ঠপোষকতা এর আগে কখনও পায়নি।

আমরা জানি প্রাকৃতজনের এই ভাষার ভিত্তিতে দুনিয়ার প্রথম রাষ্ট্রটি জন্ম নেয় '৭১ সালে। বাস্তবতা হচ্ছে, আজ অবধি বাংলার প্রযুক্তিগত সক্ষমতা মানে হচ্ছে '৭২ সালে 'অপটিমা মুনীর' টাইপরাইটার পাওয়া, '৮৭ সালে কম্পিউটারে বাংলা পত্রিকা প্রকাশ এবং '৮৮ সাল থেকে বিজয় দিয়ে বাংলা লেখা। আমরা ভাগ্যবান যে, '১৮ সালে এর প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জনের সেরা সময়ে দাঁড়িয়ে আছি। কৃতজ্ঞ জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে।

**অবাক তাকিয়ে রয়:** ২০১৭ সালের স্বাধীনতার মাস মার্চের শেষ দিন দুটি খবর বিশ্বের সকল বাংলাভাষীদের বিস্মিত করে থাকবে। প্রথমটি হচ্ছে মাইক্রোসফট বাংলা-ইংরেজি-বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছে। এই অ্যাপটি দিয়ে উইন্ডোজ ফোন, আইফোন, এন্ড্রয়েড ফোন ইত্যাদিতে বাংলাকে ইংরেজিতে ও ইংরেজিকে বাংলায় অনুবাদ করা যাবে। কাজটি একেবারেই নতুন নয়। গুগল-এর আগে এমন কাজ করার সুবিধা প্রকাশ করেছে। গুগলের মাইক্রোসফটের অনুবাদ বিনামূল্যে ব্যবহার করা যায়। গুগলের খবরটি হচ্ছে– প্রযুক্তিতে বাংলাকে আরও সমৃদ্ধ করার। তারা ২০১২ খ্রিস্টাব্দে 'নলেজগ্রাফ' নামক একটি প্রযুক্তি প্রকাশ করে, যার সহায়তায় গুগলের অনুসন্ধানকে আরও সহজ করা হয়। এবার গুগল বাংলাকেও 'নলেজগ্রাফের' আওতায় এনেছে। ২৯ মার্চ ২০১৭ তারিখে প্রকাশিত গুগলের খবরটি এ রকম: বাংলায় অনুসন্ধান করা আরও সহজ শিরোনামে প্রকাশিত। গুগলের ব্লগে বলা হয় যে, দুনিয়ার ৭ হাজার জীবিত ভাষার মাঝে ষষ্ঠ বাংলা ২০ কোটি লোক ব্যবহার করে। বুঝা যায় যে, গুগলের বাংলা ভাষাভাষীর তথ্যটা ভুল। বাংলাদেশের ১৬ কোটি, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমপরিমাণ, ত্রিপুরা ও প্রবাসী জনগোষ্ঠীকে গণনায় নিয়ে আমরা ৩৫ কোটি লোক যে বাংলায় কথা বলি, সেটি প্রমাণ করার কিছু নাই। গুগুল এটিকে বলছে যে, এর ফলে স্ট্রিং বিষয়বস্তু খুঁজে আনা হচ্ছে।

When someone conducts a search, they want an answer not trillions of webpages to scroll through. To help Bengali speakers discover new information quickly, we're now making the google knowledge raph availale in Bengali language. So next time when you're searching for cricket legend Sourav Ganguly in Bengali, we'll show you things, not strings- and you'll instantly get information that's relevant to your query such as Sourav's date of



birth, his number as an active cricket player or links to his profile on social media.

The Knowledge raph enables you to search for things, people or places that google knows about- landmarks, celebrities, cities, sports teams, buildings, geographical features, movies, ecelestial objects, works of art and more. It's not just rooted in public sources such as Freebase Wikipedia and the CIA world Facebook, it's also augmented at a much larger scale- because we're focused on comprehensive breadth and depth. The Knowledge raph is currently available in 41 langauges. mapping out how more than I billion facts about them. And it's tuned based on what people search for and what we find out on the web, improving results over time.

(https://india.gooleblog.com/2017/03/making -it-easier-to-search-9n-bengali.html)

একইসাথে গুগল বাংলা টাইপিং ভুল বা বানান ভুলকেও সহায়তা করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে বলে জানিয়েছে। ব্লগে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায় যে, কম্পিউটার টাইপ বাংলা কি-প্যাড ভুল করে লেখার পরও এই সংক্রান্ত সকল নির্দিষ্ট বিষয়াদির পাশাপাশি কিভাবে বিজয় কি-বোর্ডে বাংলা লিখবো সেটিও খুঁজে বের করা হয়েছে। গুগলের ব্লগে বলা হয়েছে "Search is a lot about discovery- learning something inspired. But especially when you're on the go or in a rush, it 's all too easy to misspell that thing you were searching for to help you get answers even when you misspelled a word, we now support spell correction for Bengali queries. So whenever a typo made its way into your search query, we'll be there to help, suggesting similar queries.

অনেকেই জানেন যে, এর আগে গুগল কথা থেকে লেখায় ও লেখা থেকে কথায় বাংলা প্রকাশ করার প্রযুক্তির পাশাপাশি বাংলা ওসিআর প্রকাশ করেছে। সেই ওসিআরটি বেশ ভালোই কাজ করে বলে দাবি করা হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, গুগল এরই মাঝে বাংলা করপাসের একটি বিশাল ভাণ্ডারও তৈরি করেছে।

সেই সময়েই আরও একটি খবরের কথা উল্লেখ করতে হয়। সেটি হচ্ছে দুনিয়ার বিখ্যাত কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক সুইজ কোম্পানি লজিটেক এবার তাদের কি-বোর্ডে বিজয় বাংলা লেআউট যুক্ত করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশের আর কোনো ভাষায় তারা লজিটেক কি-বোর্ড প্রস্তুত করে না। স্মরণযোগ্য যে, ১৯৯৮ সালে 'বিজয় বাংলা' মুদ্রিত কি-বোর্ড বাজারে আসে এবং এখন দেশের সকল কি-বোর্ডের প্রায় সিংহভাগই বিজয় বাংলা লেআউটসহ আমদানি হয়। একইসাথে আমরা স্মরণ করতে পারি যে, বাংলাদেশ সরকার বাংলা ভাষার প্রযুক্তিগত উন্নয়নে ব্যাপকভাবে কাজ করছেন। তবে আমরা সেইসব খবরতো

হয়তো রাখি না। আমরা হয়তো এখনও ভাবছি যে, আমরা মুদ্রণযন্ত্র পেয়েছিলাম ৩২৪ বছর পরে। আমরা এটাও হয়তো ভাবছি যে, টাইপরাইটার পেয়েছি ১৮৭০ সালের বদলে ১৯৭২ সালে এবং কম্পিউটারের কি-বোর্ড পেলাম মাত্র ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে, তাই নতুন ভাষাপ্রযুক্তিও আমরা সময়মতো পাবো না। এই ধারণা থেকেই একদল লোক এখনও বাঙালিকে ইংরেজ বানানোর চেষ্টা করছে।

সম্ভবত এজন্য বাংলা ভাষার যে মর্যাদা সারা দুনিয়াতে আছে, প্রযুক্তি দুনিয়া যে বাংলাকে প্রবলভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে, সেটিও সম্ভবত আমরা বাংলাভাষীদের একাংশ বুঝতে পারছি না। নিজের ভাষার সক্ষমতার বিষয়গুলোই যেন এর ভাষাভাষীদের মাঝে নেই। '১৭ সালে আমি ফেসবুকে বাংলায় নাম লেখার আবেদন করেছিলাম। শত শত বাঙালি এই আবেদনে সাড়া দিলেও কেউ কেউ আন্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়ে ইংরেজির প্রাধান্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কেউ কেউ নানা অজুহাত তুলেছেন। কেউ কেউ প্রযুক্তিগত সমস্যার কথাও বলেছেন। কিন্তু যারাই ভাবছেন যে, দুনিয়া একেবারেই ইংরেজিমুখী, তাদের হিসাবটা বোধহয় প্রযুক্তিই বদলে দিচ্ছে। আমি আগেই বলেছি যে, এমন দিন সামনে, যেদিন মানুষ ইংরেজিতে যোগাযোগ করার জন্য ইংরেজি শিখবে না। এজন্য মানুষ ইংরেজিতে নিজেকে প্রকাশ না করে মাতৃভাষায় নিজেকে প্রকাশ করবে এবং ইংরেজির জন্য বা অন্য ভাষার জন্য তারা নিজের মাতৃভাষাই ব্যবহার করবেন। এমনও দিন আসবে যে, ইংরেজি বলার জন্যও মানুষের দরকার হবে না। কেমন হবে যদি আমরা বাংলায় লিখি আর সেটি দুনিয়ার যে কোনো ভাষায় লিখিত বা কথ্য যে কোনোরূপে প্রকাশিত হয়? আমার নিজের মতে, ইংরেজি বা বিদেশি ভাষার দাসত্বের যুগের অবসান সম্ভবত খুব কাছেই। যন্ত্রপাতি যখন কথা বলা শুরু করবে, তখন ভাষা কার কোনটা সেটি ভাবারও প্রয়োজন হবে কিনা সন্দেহ রয়েছে।

**মোদের গরব মোদের আশা:** বাংলা ভাষা ও বর্ণমালার সহস্রাধিক বছরের ইতিহাসে প্রথম ও একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কায়িক যন্ত্রে একে ব্যবহার করা। তবে এই চ্যালেঞ্জ কেবল বাংলার একার ছিল না। যন্ত্রযুগের আগে পর্যন্ত দুনিয়ার সকল লেখন পদ্ধতির মতোই বাংলা ভাষা হাতে লিখে বিকশিত হতে থাকে। বাংলার প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' পুঁথি আকারে হাতে লেখা। বাংলা প্রাচীন বা পুঁথি সাহিত্য তালপাতায় লেখা শুরু হয়। কালক্রমে সেটি কাগজে হাতে লেখা আকারে বিকশিত হয়। তবে বিশ্বের অন্য ভাষা-বিশেষত রোমান হরফের ভাষাগুলো যন্ত্রযুগে পা দিলেও বাংলার যন্ত্রযুগ অনেক দেরিতে শুরু হয়। রোমান হরফে মুদ্রণযন্ত্র ও টাইপরাইটার চালু হলেও আমরা বাংলাকে এর কাছাকাছি কোনো সময়ে যন্ত্রযুগে প্রবেশ করাতে পারিনি; কিন্তু বাঙালি তার অসাধারণ মেধাকে কাজে লাগিয়ে শত শত বছর পেছনে পড়ে থাকা বাংলাকে আজকের বিশ্বে ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার প্রায় সমকক্ষভাবে যন্ত্রে ব্যবহার করার শিখরে তুলতে সক্ষম হয়েছে। দুনিয়াতে এখন এমন কোনো ডিজিটাল যন্ত্র নেই, যাতে বাংলা লেখা যায় না। অবশ্য এই কথাটিও সত্য যে, তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা প্রয়োগের চ্যালেঞ্জগুলোকেও অস্বীকার করা যাবে না। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতায় বাংলা এখনও রোমান হরফের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। অপ্রিয় সত্য হচ্ছে, বাংলাকে এমন সমকক্ষতা প্রদানের জন্য তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টাও অতীতে ছিল না। অতিসম্প্রতি আমরা সেই দুর্নাম ঘুচানোর উদ্যোগ নিয়েছি। বছরের পর বছর লড়াই করে অতিসম্প্রতি আমাদের সামনে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার বিকাশের একটি 'সুবর্ণ সময়' উপস্থিত হয়েছে। '১৭ সালের ৩ জানুয়ারি অনুমোদিত তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের ১৫৯.০২ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা এক নতুনযুগে প্রবেশ করেছে। ২০১০ সাল থেকে শুরু করে '১৭ সালে প্রকল্প অনুমোদিত হতে পারাটাকেও আমি একটি বড় বিজয় মনে করছি। কারণ এর আগে ব্রিটিশ বা পাকিস্তানি কিংবা বাংলাদেশ আমলে বাংলা ভাষার তথ্যপ্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য তেমন কোনো সরকারি আনুকূল্য পাওয়া যায়নি। অথচ আমরা এখন টের পাচ্ছি যে, বিশ্ববাসী বাংলাকে অসাধারণ মর্যাদা দিচ্ছে। আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি যে কেবল 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' বা বাংলা ভাষা সিয়েরালিওনের রাষ্ট্রভাষা হয়েছে কিংবা জাতিসংঘের অফিসিয়াল ভাষার মর্যাদা পাবার অপেক্ষায় আছে কিংবা আমরাই যে ডট.বাংলার অধিকারী সেটাই নয়– বস্তুত বিশ্বজুড়ে ৩৫ কোটি মানুষের ভাষা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম ভাষার কাতারে দাঁড়াতে যাচ্ছে। আসুন, একটু পেছনে তাকাই, আবার বর্তমান এবং সামনেও তাকাই।

**যন্ত্রে বাংলা ভাষা ॥** সিসা ও ফটোটাইপসেটার: ১৯৫৪ সালে জার্মানির গুটেনবার্গ মুভেবল টাইপ দিয়ে মুদ্রণের সূচনা করার আগেও নানা ধরনের মুদ্রণ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। বাংলা মুদ্রণের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বাংলা হরফ তৈরির কাজটি অত্যন্ত কঠিন ও জটিল ছিল। বাংলা মুদ্রণের জন্য এটি দুঃখজনক যে, জার্মানির মুদ্রণ প্রযুক্তি ১৫৫৬ সালে ভারতের গোয়ায় এলেও বাংলায় আসে ১৭৭৮ সালে। মুদ্রণযন্ত্র আসার বিলম্বের পাশাপাশি বাংলা হরফ বানানোর চ্যালেঞ্জটাও বেশ বড় ছিল। ব্রিটিশ নাগরিক 'উইলেম বোল্টসন এক ফন্ট (কোনো ভাষার সকল বর্ণ ও চিহ্ন যা মুদ্রণে ব্যবহৃত হয় তাকে ফন্ট বলে) বাংলা হরফ নির্মাণের কাজে লন্ডনের বিখ্যাত শিল্পীদের নিযুক্ত করেন। কিন্তু বাংলা টাইপ তৈরির কাজ অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল এবং ব্যয়সাপেক্ষ বলে বোল্টসনের বাংলা হরফ নির্মাণের কাজ বেশি দূর অগ্রসর হয়নি।'

(কম্পিউটারে প্রকাশনা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মোস্তফা জব্বার পৃ:৪১) বোল্টসনের ব্যর্থতার কথা বলা হলেও তিনি ও জ্যাকসন বাংলা হরফ তৈরির প্রাথমিক পদক্ষেপে সফল হন। তবে যার ডিজাইন করা বর্ণমালা দিয়ে বাংলা বই প্রথম মুদ্রিত হয়, তার নাম চার্লস উইলকিনস । এতে পঞ্চানন কর্মকার নামক এক বাঙালিরও অসাধারণ অবদান ছিল।

মুদ্রণপ্রযুক্তি বিকাশের সাথে সাথে বহুজাতিক কোম্পানি লাইনোটাইপ ও মনোটাইপ বাংলা হরফ তৈরির কাজ করেছে ফটোটাইপসেটারের যুগ অবধি। বিশেষত এই দুটি কোম্পানির হাতে লাইনো ও মনো কাস্টিং মেশিন তৈরি হবার ফলে বাংলা মুদ্রণের টাইপোগ্রাফিক পশ্চাৎপদতা অনেকটা কেটে যায়। একইভাবে বিশেষত লাইনোটাইপ তাদের তৈরি ফটোটাইপসেটারে বাংলা হরফের অসাধারণ সৌন্দর্য বিকশিত করে। বাংলা টাইপোগ্রাফির ক্ষেত্রে ইংরেজ রমণী ফিয়োনা রস-এর

কথা না স্মরণ করলে সেটি অন্যায় হবে। ফটোটাইপসেটারের অসাধারণ বাংলা ফন্টটি তারই তৈরি করা।

**যন্ত্রে বাংলা ভাষা ॥** টাইপরাইটার: অন্যদিকে রোমান হরফের জন্য ১৮৭০ সালে টাইপরাইটার প্রচলিত হলেও বাংলাদেশে বাংলা টাইপরাইটার প্রচলিত হয় ১৯৭২ সালে। ১৯৬৯ সালে শহিদ মুনীর চৌধুরী যে কি-বোর্ডটি প্রণয়ন করেন, তারই আলোকে পূর্ব জার্মানির অপটিমা কোম্পানি 'অপটিমা মুনীর' টাইপরাইটার তৈরি করে, যার সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা চালু করে। রোমান কি-বোর্ডের পেটেন্ট রেমিংটন কোম্পানির থাকার সুবাদে তারা বাংলা টাইপরাইটার তৈরি করেছিল, যা দিয়ে সত্তর দশকে লন্ডন থেকে 'জনমত' নামক একটি সাপ্তাহিক প্রকাশের খবর জানা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেও একটি রেমিংটন বাংলা টাইপরাইটার ছিল। ভারতে রেমিংটন টাইপরাইটার প্রচলিত ছিল বলেও জানা যায়। পাকিস্তান সরকার অফিসে বাংলা ব্যবহার করেনি বলে সেটি ভারত থেকে ব্যাপকভাবে ঢাকায় আসেনি।

**তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা ও বর্ণমালা:** 'প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে কম্পিউটারে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। বিটস পত্রিকায় (এপ্রিল '৮৮) প্রকাশিত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক প্রধান সৈয়দ মাহবুবুর রহমানের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ১৯৮২ সালে তার বিভাগে কম্পিউটারে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য গবেষণার কাজ শুরু হয়। এরপর গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ের অগ্রগতির বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'বিভিন্ন চওড়ার অক্ষর প্রদর্শনের জন্য ইলেক্ট্রনিক সার্কিট তৈরির কাজ আমরা ১৯৮৫ সালের শেষার্ধে সমাপ্ত করেছি। কি-বোর্ড এবং কোড তৈরির কাজ সমাপ্ত হয় ১৯৮৬ সালে। জনাব রহমানের বর্ণনামতে, কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহারের সব কাজই তারা শেষ করেছেন; কিন্তু শেষ করে কি করেছেন তা জানা যায়নি। তাদের সে কীর্তি কেউ দেখতে পায়নি। (সূত্র: মুহম্মদ জালাল, মাসিক সাঁকো, ডিসেম্বর ২০০৪)। তবে আমার জানামতে, ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত 'শহিদ লিপি'ই হচ্ছে প্রথম বাংলা সফটওয়্যার, যা দিয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে কম্পিউটারে বাংলা লেখলেখি করা যেতো। এটি ছিল অ্যাপল কম্পিউটারের তৈরি মেকিন্টোস কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম এবং ম্যাকরাইট নামক এপ্লিকেশন প্রোগ্রামের বাংলা অনুবাদ। শহিদ সাহেব প্রথমে ডট. মেট্রিক্স ও পরে লেজার প্রিন্টারের বাংলা ফন্টও তৈরি করেন। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি বাজারজাতকৃত মেকিন্টোস কম্পিউটারের জন্য সাইফুদ্দার শহিদের তৈরি এই সফটওয়্যারটি প্রথম ১৯৮৬ সালে ব্যবহার করে NIMCO (জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট)। এরপর শহিদ সাহেবের শহিদলিপি দৈনিক আজাদ, পাক্ষিক তারকালোক ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নামক প্রতিষ্ঠানে প্রকাশনার জন্যও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সফটওয়্যারটি ম্যাক ও এস পরিবর্তনের সাথে সাথে আপডেট না হওয়ায় এবং উইন্ডোজ সংস্করণ প্রকাশিত না হওয়ায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।



তবে কম্পিউটারে বাংলা প্রয়োগের আজকের যে প্রবহমান ধারা, তার সূচনা ১৯৮৭ সালের ১৬ মে– আমি যখন আমার সম্পাদনায় 'সাপ্তাহিক আনন্দপত্র' প্রকাশ করি, তখন থেকে। আমি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার রাহুল কমার্স নামক একটি প্রতিষ্ঠানের গৌতম সেন ও স্বাতী বন্দোপাধ্যায়ের তৈরি 'বঙ্কিম ফন্ট' এবং 'জব্বার কি-বোর্ড' অনুসারে সৈয়দ মাইনুল হাসান সম্পাদিত মাইনুল লিপি দিয়ে আনন্দপত্র প্রকাশ করি। জনাব মাইনুল হাসান আমার অনুরোধে বঙ্কিম ফন্টের কি-ম্যাপিং বদল করে মুনীর কি-বোর্ড– এর প্রথম দুটি স্তর এবং আমার তৈরি তৃতীয় ও চতুর্থ স্তর অনুযায়ী 'মাইনুল লিপি' তৈরি করেন। আমি সেই কি-বোর্ডের নাম রেখেছিলাম 'জব্বার কি-বোর্ড'।

চার্লস উইলকিন্সের হাতে তৈরি বাংলা হরফের পর ফটোটাইপসেটারে আনন্দবাজারগোষ্ঠীর তৈরি করা চমৎকার যে বাংলা হরফ আমরা পেয়েছিলাম– তার গৌতম-স্বাতী বা মাইনুলের বঙ্কিম/মাইনুল লিপি ফ্রন্ট ছিল হতাশাজনক। মাত্র ৩০০ ডিপিআই লেজার প্রিন্টার ফন্টটির অদ্ভুত (অথবা কুৎসিত) চেহারা কোনোমতেই বাঙালির মনের ক্ষুধা মেটাতে পারেনি। কিন্তু বিস্ময়করভাবে সেই ফন্টটি ২৫৬ কোডের কম্পিউটারে ১৮৮টি কোড ব্যবহার করে বাংলা লিপিকে প্রায় অবিকৃত করে প্রকাশ করেছিল। যদিও ডিজাইনে ত্রুটি ছিল এবং সেই হরফে মোটেই পেশাদারিত্ব ছিল না, তবুও মুদ্রক বা প্রকাশকরা সেই ফন্ট দেখে ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী হতে পেরেছিলেন। সেই ঘটনার মাত্র চারমাসের মাথায় আমি আমার হাতে তৈরি প্রথম ফন্ট 'আনন্দ' প্রকাশ করি। এই ফন্টটি আশ্চর্যজনকভাবে বঙ্কিম ফন্টের ডিজাইন ত্রুটি কাটিয়ে ওঠে এবং সাপ্তাহিক-মাসিক তো বটেই দৈনিক পত্রিকার বাহন হয়ে যায়। দেশের অন্যতম প্রাচীন দৈনিক পত্রিকা 'আজাদ' তাকে গ্রহণ করে এবং একটি নতুন ইতিহাসের জন্ম হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, সেই ফন্টটির ডিজাইনার ছিল স্নেহভাজন হামিদুল ইসলাম। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হামিদুল ইসলামের পর 'বিজয়'-এর জন্য ফন্ট ডিজাইন করেছেন যারা, তাদের মাঝে উজ্জ্বল কুমার দত্ত ও শিবনারায়ণ দাশও আছেন।

তবে আজকের দিনে বাংলা কম্পিউটারের কি-বোর্ডের জন্ম প্রকৃতার্থ ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর। ঐদিন আমি 'বিজয়' কি-বোর্ড এবং তন্বী সুনন্দা ফন্ট প্রকাশ করি। বিজয় কি-বোর্ডের সুবাদে আমি ১৮৮টির বদলে ২২০টি বর্ণ ব্যবহার করতে সক্ষম হই। ফলে বাংলা ভাষা আরো চমৎকারভাবে কম্পিউটারের পর্দায় উপস্থিত হয়।

কম্পিউটারে বাংলা ভাষা প্রয়োগের প্রচেষ্টা আরো অনেক হয়েছে। মেকিন্টোস কম্পিউটারের গ্রাফিক্স সুবিধা কাজে লাগিয়ে এতে ফন্ট তৈরি করেন মাহমুদ হোসেন রতন ও ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। অ্যাপল কম্পিউটার কোম্পানি মেকিন্টোস কম্পিউটারের আগে বাজারজাতকৃত অ্যাপল সিরিজের কম্পিউটারের জন্য গুটেনবার্গ নামক একটি সফটওয়্যার প্রচলিত ছিল, যাতে বাংলা লেখা যেতো। অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী বাঙালি হেমায়েত হোসেনও কম্পিউটারে বাংলা নিয়ে কাজ করেন।

অন্যদিকে পিসিতে ডসের অধীনে দোয়ান জান, আবহ, বর্ণ, অনির্বাণ ইত্যাদি সফটওয়্যারের আত্মপ্রকাশ ঘটে। যেহেতু প্রায় সকল অফিস-আদালতেই পিসি ব্যবহৃত হতো, সেহেতু ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এসব জায়গায় টাইপরাইটারের মানের এসব সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে যেহেতু মুদ্রণমানটি চিঠিপত্রের মানের সাথে কোনোমতেই খাপ খায় না, সেহেতু মুদ্রণ, প্রকাশনা, সাময়িকী ও সংবাদপত্রে বিজয়-মেকিন্টোসের একচেটিয়া রাজত্ব চলতে থাকে।

কার্যত ২৬ মার্চ ১৯৯৩ তে পিসির উইন্ডোজে বিজয় কি-বোর্ড ও সফটওয়্যার প্রকাশিত হবার পূর্বপর্যন্ত ম্যাক ও পিসির বাংলা সুস্পষ্টভাবে বিভাজিত ছিল। মুদ্রণ ও প্রকাশনায় সচরাচর পিসি ব্যবহৃত হতো না। কিন্তু উইন্ডোজের 'বিজয়' বার্লিন দেয়ালের মতো এই বিভাজন রেখাটি ভেঙে দেয়। একই অ্যাপ্লিকেশন, একই ফন্ট, একই কি-বোর্ড, একই উপায়ে বাংলা লেখা– এমনকি একই এনকোডিং ম্যাক পিসির পার্থক্য ঘুচিয়ে দেয়। ম্যাক ও উইন্ডোজে বাংলা প্রচলিত হবার পর মুক্ত ও এস লাইনাক্সেও বাংলা প্রচলিত হয়। পরবর্তীতে নতুন শতকে ইউনিকোড এনকোডিং বিশেষত ইন্টারনেটে আসকিকে স্থলাভিষিক্ত করে এবং ধীর ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এর চতুর্থ সংস্করণ থেকে বাংলা ভাষার ইউনিকোড এনকোডিং ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে এবং ২০০৪-এর শেষপ্রান্তে এসে আমাদের 'বিজয় ইউনিকোড'ও একটি ভিন্ন এনকোডিং পদ্ধতি ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে এবং পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করে। ডা. মেহেদী হাসান খান নামক এক তরুণ ২০০৩ সালে ইউনিবিজয় নামক ইউনিকোডভিত্তিক একটি বাংলা সফ্‌টওয়্যার তৈরি করেন, যা পরবর্তীতে 'অভ্র' নামে পরিচিত হয়। ইউনিবিজয় ছিল বিজয় কি-বোর্ডভিত্তিক ইউনিকোডে বাংলা লেখার বিজয়-এর অনুমোদনবিহীন সফটওয়্যার, যা থেকে পরে বিজয় কি-বোর্ড প্রত্যাহার করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা একটি বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসর তৈরির চেষ্টা করেন, যা আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি বলে নিজেই স্বীকার করেছেন, অন্যদিকে শামীম হাসনাত 'রিদমিক' নামক একটি সফটওয়্যার তৈরি করেছেন, যা অ্যান্ড্রয়েডে চলে। 'মায়াবী' নামে আরও একটি সফটওয়্যার দিয়ে স্মার্টফোনে লেখা যায়। এই সময়ের মাঝে বিজয়-এর অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। অনেক আগেই বিজয়-এর লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। ফলে এখন আমাদের হাতের কাছে এমন কোনো ডিজিটাল যন্ত্র নেই, যাতে বাংলা লেখা যায় না।

এখনকার দুনিয়ায় বাংলা ভাষার জন্য বিজয়–এর ঐতিহ্যগত আসকি, যেটি শুরুতে ১৯৮৮ সালে ও পরে তিনটি অক্ষরের কোডে সংশোধন করে ২০০৪ সালে চালু করা হয়। তার পাশাপাশি ইউনিকোড এনকোডিং প্রচলিত হয়। ইউনিকোড-এর দশম সংস্করণ- ১৭ সালে প্রচলিত হয়েছে। নতুন সংস্করণটিতে 'আনাজি' নামের একটি নতুন অক্ষর ও আরও বৈদিক অনুস্বরও বাংলা এব্রিব্রিয়েশন নামক দুটি চিহ্ন যুক্ত হয়েছে। বাকি সব আগের মতোই আছে। বাংলাদেশ সরকার ইউনিকোডকে ভিত্তি করে বিডিএস ১৫২০:২০১৮ নামক একটি মানকে প্রমিত করেছে। এরই মাঝে বিজয়-এর উইন্ডোজ, ম্যাক, লিনাক্স, অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস অপারেটিং সিস্টেমের



ইউনিকোড সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। গুগল, অ্যাপল, মাইক্রোসফট ইত্যদি প্রতিষ্ঠানও ইউনিকোডে বাংলা লেখার ইনপুট মেথড ও ফন্ট প্রকাশ করেছে। বলে রাখা ভালো, তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা প্রয়োগে ভারতের প্রচেষ্টাগুলো আমরা উপস্থাপন করতে পারিনি। ভারতে বিজয় ও অভ্রসহ বাংলাদেশি সফটওয়্যার ব্যবহৃত হলেও সেখানে নিজস্ব কি-বোর্ড ও ফন্ট নিয়েছে, যার সাথে বাংলাদেশের ব্যবহারকারীদের কোনো সম্পর্ক নেই। ভারতের শ্রীলিপি, এসপিএম, প্রভাত ইত্যাদি সফটওয়্যার ব্যবহার করে বলে শুনেছি। তবে বাংলাদেশে কেউ ভারতের কোনো সফটওয়্যার ব্যবহার করে কিনা জানি না। প্রবাসে বসবাসকারী বাংলাদেশের নাগরিকেরা প্রধানত 'বিজয়' ব্যবহার করে। কেউ কেউ অভ্র এবং প্রভাত ও রিদমিক ব্যবহার করে বলে জানা যায়।

একুশ শতকের প্রথম প্রান্তে যদিও আমরা তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা ও বর্ণমালা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশ্বের বহু ভাষার সমকক্ষতা অর্জন করেছি, তথাপি বাংলার জন্য আমাদের করণীয় রয়েছে অনেক। বিশেষ করে, রোমান হরফ ও তার সাথে সম্পৃক্ত ভাষাগুলো যেসব সক্ষমতা অর্জন করেছে, সেগুলোতে বাংলা ভাষা ও বাংলা হরফ এখনও অর্জন করতে পারেনি। বাংলা বানান ও ব্যাকরণ শুদ্ধ করা, কথাকে লিখিত রূপদান ও লিখিত বিষয়কে কথায় রূপান্তর, ইন্টারনেটের স্ক্রিন রিড করা, বাংলার করপাস তৈরি করা, অপটিক্যাল কারেক্টার রিডার তৈরি করাসহ অনেক তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা বাংলা ভাষা ও বর্ণমালায় যুক্ত করতে হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্বাধীনতার এতোদিন পরেও তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা লেখার কাজটি ছাড়া অন্য কোনোক্ষেত্রেই আমরা তেমন সফলতা অর্জন করিনি। এমনকি আমরা সম্ভবত তেমন আন্তরিকভাবে চেষ্টাও করিনি। যেসব ছোটখাটো চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলোও অপ্রতুল, সমন্বয়হীন ও যথাযথ ছিল না। আমাদের জানা যেসব প্রচেষ্টা তেমন ফলদায়ক হয়নি, তার মাঝে রয়েছে 'প্রমিত কি-বোর্ড ও ফন্ট' উন্নয়নের প্রচেষ্টা, বাংলা ওসিআর উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাংলা ভাষা বিষয়ক গবেষণা কর্মকাণ্ড। এসব প্রচেষ্টার প্রকৃত সফলতা পেতে পারেনি বলেই প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় বড় কিছুর আয়োজন করার।

**সোনালি সময়ের সামনে দাঁড়িয়ে:** আমাদের সৌভাগ্য যে, ২০১৭ সালের ৩ জানুয়ারি জননেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেকের সভায় ১৫৯ কোটি ২ লাখ টাকার একটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তরকালতো বটেই, বাংলা ভাষা ও বর্ণমালার ইতিহাসে কোনো সরকার এতো বড় প্রকল্প গ্রহণ করেনি। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগকে। একনেক সভায় উপস্থিত মান্যবরদের সৌজন্যে জানা গেছে যে, এ প্রকল্প অনুমোদনে প্রধানমন্ত্রী যতোটা আনন্দিত হয়েছেন, আর কোনো প্রকল্প অনুমোদনে ততোটা হতে দেখা যায়নি। এটি প্রমাণ করে যে, প্রধানমন্ত্রী নিজে বাংলা ভাষার বিকাশে কতোটা আন্তরিক।

আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে বিশ্বজুড়ে পালিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর হাতেই আরও একটি অর্জন হয় আমাদের। তিনি নিজের

হাতে ডট.বাংলা ডমেইনের আবেদন করে ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর সেটির উদ্বোধন করতে পারলেন। তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার বিকাশে এটি একটি বিরাট অর্জন ও বিরাট মাইলফলক। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী অনুমোদিত ১৫৯.০২ লাখ টাকার প্রকল্পটি বাংলা ভাষা ও বর্ণমালাকে নিয়ে যাবে এক উচ্চতর আসনে। আমরা ডিজিটাল যুগে বাংলা ভাষা ব্যবহারের যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছি, তার প্রায় সবগুলোরই সমাধান রয়েছে এই প্রকল্পে। যদি প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতা ও স্বপ্নকে আমরা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি, তবে বাংলা ভাষা বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠতম ভাষায় পরিণত হবে। বাংলা বর্ণমালাও হবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বর্ণমালা। তথ্যপ্রযুক্তিতে 'বাংলা ভাষার উন্নয়ন' নামক যে প্রকল্পটি সরকার অনুমোদন দিলো তারও একটি লম্বা ইতিহাস রয়েছে। আমরা বছরের পর বছর ধরে বাংলা ভাষার উন্নয়নে কাজ করার জন্য সরকারের পিছু ধর্না দিয়ে আসছিলাম। আমার মনে আছে, ২০১০ সালের ৩০ আগস্ট কম্পিউটারে বাংলা ভাষা প্রমিতকরণ কমিটির ৫ম সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এরকম– 'তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগ-সংক্রান্ত ৫টি গবেষণা কর্মসূচি বিসিসি গ্রহণ করবে। উক্ত কর্মসূচিসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের নিমিত্ত বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হবে।' ২০১০ সালে সেই সিদ্ধান্ত বছরের পর বছরের পরিশ্রমের ফলে বাস্তব রূপ নেয়। কম্পিউটার কাউন্সিলের সদ্যবিদায়ী নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, বর্তমান পরিচালক এনামুল কবির, তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার গবেষক হাসনাত শাহরিয়ার প্রান্ত, প্রফেসর মনসুর মুসা, মুনির হাসান এবং আমি নিজে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে এমন একটি প্রকল্প গ্রহণ করাতে সক্ষম হই। এর সম্ভাব্যতা যাচাই করাটা কঠিনতম একটি কাজ ছিল। সেটি আমরা করেছিলাম। এখন প্রকল্পটি চলমান অবস্থায় রয়েছে।

কাকতালীয়ভাবে আমি আমার নিজের ফেসবুকের টাইমলাইনে কিছু স্মৃতি পেলাম। তাতে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করার প্রেক্ষিত বিষয়ক তথ্য রয়েছে। তথ্যগুলো এরকম: 'কম্পিউটারে বাংলা ভাষার ব্যবহার সমৃদ্ধকরণের জন্য প্রকল্প গৃহিত বিজয়-এর স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্তঃ সরকার কম্পিউটারে বাংলা ভাষার ব্যবহার সমৃদ্ধকরণ করার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ গৃহিত এই প্রকল্পের আওতায় ১. ইউনিকোড ও বাংলা বর্ণমালার কোড সেট: বিবেচনায় রেখে বাংলা সর্টিং অর্ডার নির্ধারণ, ২. বাংলা করপাস উন্নয়ন/সমৃদ্ধকরণ, ৩. বাংলা বানান ও ব্যাকরণ পরীক্ষক উন্নয়ন, ৪. বাংলা ভাষার টেক্সট টু স্পিচ ও স্পিচ টু টেক্সট সফটওয়্যার উন্নয়ন, ৫. বাংলা ফন্ট কনর্ভার্টার উন্নয়ন, ৬. তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা লিখিত রূপ নির্ধারণ, ৭. বাংলা মেশিন ট্রান্সলেশন, ৮. বাংলা স্ক্রিন রিডার সফটওয়্যার, ৯. প্রতিবন্ধীদের জন্য সফটওয়্যার, ১০. বাংলা ফন্ট এবং সফটওয়্যার অন্তর্ভুক্তিকরণ ১১. বাংলা ওসিআর উন্নয়ন ইত্যাদিসহ মোট ১৬টি টুল উন্নয়নের জন্য এই প্রকল্প গৃহিত হয়। আজ ১১ এপ্রিল ১৬ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রমিতকরণ-সংক্রান্ত কমিটির এক সভায় বিষয়টি অবহিত করা হয়।



সভায় কমিটির সদস্য প্রফেসর মনসুর মুসা, মোস্তফা জব্বার, হাসনাত শাহরিয়ার প্রান্ত, এনামুল কবির এবং বিসিএস ও মাইক্রোসফটের প্রতিনিধিসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন, সভায় এই কমিটির বিগত সভার মিনিটসও অনুমোদিত হয়। সেই মিনিটস অনুসারে বিজয় বাংলা কি-বোর্ড ও জাতীয় কি-বোর্ডের বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়। বিজয়-এর অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানেরও সিদ্ধান্ত হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট বিজয় কি-বোর্ডকে জাতীয় মান হিসেবে ঘোষণা করার জন্য ইটি-১৫ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। কিন্তু তৎকালীন সরকার মোস্তফা জব্বার প্রণীত বিজয় কি-বোর্ডকে 'জাতীয় মান' হিসেবে মানতে পারেনি। ফল সেইদিন ইটি-১৫ এর সভা স্থগিত করা হয়। পরে সেই কমিটি ভেঙে দেয়া হয় এবং নতুন করে নির্দেশনা দিয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে কি-বোর্ডসহ বাংলা ভাষা প্রমিতকরণের সকল দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সেই সুবাদে কম্পিউটার কাউন্সিলের তৎকালীন কমিটির সুপারিশে বিজয় কি-বোর্ডকে নকল করে তৈরি করা হয় জাতীয় কি-বোর্ড। আইন ভঙ্গ করে তার কপিরাইট নিবন্ধনও হয়। তবে কপিরাইট অফিসে প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে এই কমিটির সিদ্ধান্তেই স্থগিত হয় তথাকথিত জাতীয় কি-বোর্ড। তারই ধারাবাহিকতায় গত ৮ আগস্ট ১৫ অনুষ্ঠিত তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রমিতকরণ-সংক্রান্ত কমিটির সভায় বিষয়টি আলোচিত হয়। সেই সভার মিনিটস অনুসারে আলোচনার শিরোনাম ছিল, জাতীয় কি-বোর্ড আধুনিকায়ন। আলোচনায় বলা হয়, কপিরাইট অফিসে বিদ্যমান জাতীয় কি-বোর্ড ও বিজয় কি-বোর্ড সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিজয় কি-বোর্ড প্রণেতা মোস্তফা জব্বার বিদ্যমান জাতীয় কি-বোর্ডটি বিজয় কি-বোর্ডের অনুসরণে প্রণীত মর্মে মত ব্যক্ত করেন। দেশের অধিকাংশ বাংলা ব্যবহারকারীদের কাছে জনপ্রিয় বিজয় কি-বোর্ডের স্থলে জাতীয় কি-বোর্ডকে গ্রহণযোগ্য করতে হলে এর পরিবর্তন ও পরিমার্জন যেমন (১) চারস্তরের স্থলে দুই স্তরের, (২) কি-লেআউটে বিজয় কি-বোর্ডের আদলে ও এর বোতামের অবস্থান অনুরূপকরণসহ অন্যান্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় কি-বোর্ডের আধুনিকায়নের ফলে তা বিজয় কি-বোর্ডের অনুরূপ হলেও 'দেশের স্বার্থে কোনো অভিযোগ বা আপত্তি উত্থাপন করা হবে না' মর্মে তিনি কমিটিকে জানান। বাংলা ব্যবহারকারীদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় কি-বোর্ডের আধুনিকায়ন করার পাশাপাশি বিজয় কি-বোর্ড প্রণেতার অবদানের যথোপযুক্ত স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মর্মে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন। আজকের সভায়ও বিজয় কি-বোর্ডকে স্বীকৃতি দেয়া ও বিষয়টির নিষ্পত্তি করার জন্য সদস্যগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন।'

তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই সভাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একইসাথে ২০১০ সাল থেকে কম্পিউটার কাউন্সিলের বাংলা ভাষা প্রমিতকরণ কমিটির প্রচেষ্টাও উল্লেখ করার মতো। আমি বিশেষত এই কমিটির সকল সদস্যসহ প্রান্ত, এনাম সাহেব ও আশরাফ সাহেবকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই। তথ্যপ্রযুক্তিতে

বাংলা ভাষার অগ্রযাত্রায় তারা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অন্যদিকে এই কমিটিতে মাহফুজ সাহেবসহ অন্য যারা অবদান রেখেছেন, তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা।

তবে আমি অনেক বেশি আনন্দিত এজন্য যে, কম্পিউটারে বাংলা ভাষার প্রমিতকরণের কাজটি এরই মাঝে সম্পন্ন হয়েছে। এই বিষয়ে প্রথম বড় সিদ্ধান্ত হয় ১৭ সালের আগস্টে। গত ৮ আগস্ট ২০১৭ দুপুর বারোটায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সম্মেলন কক্ষে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা প্রমিতকরণ কমিটির এক সভা বিসিসির নির্বাহী পরিচালক স্বপন কুমার মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রফেসর মনসুর মুসা, শিশির ভট্টাচার্য, বিসিএস সভাপতি আলী আশফাক, আমি ও বিভিন্ন সংস্থা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। সভায় এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত তথ্যপ্রযুক্তির প্রমিতকরণের বিষয়গুলো আলোচিত হয়। এতে বিজয় কি-বোর্ড-এর মেধাস্বত্ব এবং স্বীকৃতি ও সম্মানী প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় আইপিএ ফন্ট-এর মান প্রমিতকরণ, বিডিএস ১৫২০:২০১১ মান উন্নয়ন, উপজাতীয় বর্ণমালার কোডিং কি-বোর্ড মান প্রমিতকরণ এবং প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এরপর গত ২৮ জানুয়ারি ১৮ কম্পিউটারে বাংলা ভাষা প্রমিতকরণ কমিটির এক সভা কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক স্বপন কুমার সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে স্মারক নং ৫৬:০১:০০০০,০০৭, ০৬৩,১৪,৩০১৪ সূত্রের পত্রে বাংলাদেশ স্টান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকের কাছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের পরিচালক বিডিএস ১৭৩৮:২০০৪, বিডিএস ১৫২০:২০১১ এর আপডেট এবং BSCI ও এর নতুন প্রমিত কোড পাঠান। ২৮ জানুয়ারি ১৮এর সভায় ২.১.২ সিদ্ধান্তে বিডিএস ১৫২০:২০১১ এর আপডেট হিসেবে ইউনিকোড ১০.০ এর সম্পূর্ণটাকেই বাংলা ভাষার ইউনিকোড হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সভার ২.১.৫ সিদ্ধান্তে বলা হয়, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্পের আওতায় জাতীয় কি-বোর্ড-এর আধুনিকায়নের কাজ দেশে প্রচলিত জনপ্রিয় কি-বোর্ডকে (বিজয় কি-বোর্ড) স্বীকৃতি দিয়ে সম্পন্ন করার বিষয়ে কমিটির পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করে প্রস্তুতকৃত জাতীয় কি-বোর্ডের খসড়া সভায় উপস্থাপন করা হয়, যা পর্যালোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়। গত ০৮-০৮-১৭ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশে প্রচলিত জনপ্রিয় বাংলা কি-বোর্ড বিজয়কে স্বীকৃতিমূলক বাক্য এ মানের খসড়ায় সংযোজনের সুপারিশ করা হয়। যেহেতু মানটি বিজয়-এর অনুসরণে প্রস্তুতকৃত, তাই অনাপত্তি জ্ঞাপনসহ অনুমতি প্রদানের জন্য পত্র দিতে সুপারিশ করা হয়। অনুমোদিত মানের খসড়া বিএসটিআইসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্ট্যাকহোল্ডদের নিকট প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিএসটিআই কর্তৃক মান নির্ধারণ সম্পন্ন হলে DBLICT প্রকল্পের জাতীয় কি-বোর্ড-এর আধুনিকায়ন কম্পোনেন্টের কাজে তা ব্যবহার করা হবে। সভার ২.১.৬ সিদ্ধান্তে বলা হয়, 'দেশে গবেষণা ও অন্যান্য কাজে ASCII এর মাধ্যমে সফটওয়্যার উন্নয়ন ও অন্যান্য ব্যবহার সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুবিধার্থে ASCII



ভিত্তিক 'Bangladesh Standard Code for Information Interchange (BSCII)' শীর্ষক একটি নতুন মান সভায় প্রস্তাব করা হয়, যা পর্যালোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। তবে যেহেতু প্রস্তাবকৃত মানটি বিজয়- এর ASCII চার্ট-এর অনুসরণে প্রস্তুতকৃত, সেহেতু অনাপত্তিসহ ব্যবহারের অনুমাতি প্রদানের জন্য বিজয় বাংলা সফটওয়্যারের প্রণেতাকে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানোর সুপারিশ করা হয়।' এরই প্রেক্ষিতে বিডিএস ১৫২০:২০১৮, বিএস ১৭৩৮:২০১৮ এবং বিডিএস ১৯৩৫:২০১৮ বিএসটিআই কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

একই সভায় বাংলা আইপিএ ফন্ট, উপজাতীয় ভাষাসমূহ এবং বাংলা ইশারা ভাষায় প্রমিতকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সুখের বিষয় এই যে, এ নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত বাংলা ইশারা ভাষা এবং আইপিএ-এর মান স্থির করা হয়েছে। কিছুদিনের মাঝেই এই দুটির প্রমিত মান আমরা পেয়ে যাবো এবং উপজাতীয় ভাষারও কি-বোর্ডসমূহ প্রমিত হয়ে যাবে।

তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের বিসিসির প্রকল্পে মোট ১৬টি টুল উন্নয়ন করার প্রস্তাবনা রয়েছে। প্রতিটি টুল বাংলাকে বিশ্বের যে কোনো ভাষার সমকক্ষতা দেবার জন্য ডিজাইন করা। আমরা এই টুলগুলো ও তার প্রয়োজনীয়তার সাথে পরিচিত হতে পারি। প্রকল্পটির বিস্তারিত পরিচিতির অংশ হিসেবে সরকারের গৃহিত প্রকল্পের ভূমিকায় এর উদ্দেশ্যে হিসেবে বলা হয়েছে; ক. কম্পিউটিং-এ বাংলাকে বিশ্ব দরবারে নেতৃত্ব দানকারী ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। খ. তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহারের বিভিন্ন বিষয় প্রমিত করা। গ. বাংলা কম্পিউটিং-এর জন্য টুলস, প্রযুক্তি ও উপাত্ত উন্নয়ন করা।

প্রায় ১৫৯.০২ কোটি টাকার গৃহিত প্রকল্প দলিলে আরও বলা হয় যে, ১৬টি টুল উন্নয়ন করার ফলে বাংলা ব্যবহারকারীরা বিশ্বমানে বাংলা ব্যবহার করতে পারবে এবং বাংলা সিএলডিআর, আইপিএ, করপাস, কি-বোর্ড ও ফন্ট প্রমিত হবে। কোনো সনেদহ নাই যে, এই প্রকল্পটি বাংলার জন্য একটি মাইলফলক ও স্বপ্নের প্রকল্প। এটির বাস্তবায়ন যে, বিশ্বের প্রযুক্তিগত সক্ষমতাসম্পন্ন ভাষাগুলোর কাতারে বাংলাকে দাঁড় করিয়ে দেবে, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। হয়তো কোটি টাকার প্রশ্নটি হবে প্রকল্পটি কতোটা কতদিনে কীভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে।

**ভাষাংশ বা করপাস:** ১৬টি টুলের মাঝে রয়েছে ভাষাংশ বা করপাস। এই ভাষাংশ যতো সমৃদ্ধ হবে, তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ব্যবহারও ততোই সমৃদ্ধ হবে। এর ফলে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার আরও বহুগুণ সমৃদ্ধ হবে। বানান শুদ্ধিকরণ, ব্যাকরণ শুদ্ধিকরণ, যান্ত্রিক অনুবাদ, আবেগ বিশ্লেষণসহ ১৬টি টুলের অনেকগুলোর কাজ এর ওপরই নির্ভর করবে। প্রকল্পে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে এই করপাস তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। এটি আমাদের বুঝার দরকার যে, ভাষাংশ বা করপাস চিহ্নিত না করাটা ডিজিটাল যুগে বাংলার অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেবে। ভাষার সমৃদ্ধি ও তথ্যপ্রযুক্তির সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের জন্য করপাস ভাণ্ডার গড়ে তোলা আবশ্যক। কার্যত ভাষাংশকে ভিত্তি করেই প্রকল্পের ১৬টি টুলের অনেকগুলো গড়ে উঠবে। ইতোমধ্যে গুগল ভাষাংশ নিয়ে বেশ কিছু কাজ করেছে, যেটি

স্বেচ্ছাসেবীভাবে করে তারা তাদের নিজেদের কাজে ব্যবহার করছে। তবে তাদের ভাষাংশটি অপ্রতুল। রোমান হরফের বিদ্যমান ৫২ কোটি ভাষাংশের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। গুগল মাত্র কয়েক লাখ বাংলা ভাষাংশ গড়ে তুলতে পেরেছে। আমার জানা মতে, সেটি ৪ লাখের বেশি নয়। সেজন্য সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের বাংলা ভাষাংশ গড়ে তুলতে হবে। অনুমোদিত প্রকল্পের বৃহত্তর অংশ এটি। পুরো প্রকল্প বরাদ্দের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই খাতেই বরাদ্দ করা আছে।

**বাংলা ওসিআর:** যদিও এরই মাঝে বাংলা ওসিআর নিয়ে বেশ কিছু কাজ হয়েছে, তবুও এটি বাস্তবতা যে, এই উন্নয়নগুলো বাংলা ব্যবহারকারীদের তেমন কোনো কাজে লাগে না। এটি অপ্রিয় সত্য যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থের অপচয় হয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ পাওয়া যায়নি। রাতারাতি যে এসব প্রযুক্তি কাজ করবে, তেমন নয়। রোমান ওসিআর তৈরি হতে যুগের পর যুগ সময় লেগেছে। বাংলায় কেবল অতি সাম্প্রতিককালে ওসিআর তৈরির প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। প্রচেষ্টাগুলোর সবচেয়ে দুর্বল দিকগুলো হচ্ছে যে, এগুলো সমন্বিতভাবে ধারাবাহিক কর্মপ্রচেষ্টা হিসেবে সামনে আগায়নি। বরং ওসিআর বিষয়ক সকল প্রকল্পই এখন থেমে আছে। অথচ ওসিআর কাজ করলে বাংলা ভাষার সবচেয়ে অগ্রগতি হবে যে, প্রাচীন বা বর্তমান কাগজে বা হাতের লেখায় সঞ্চিত রচনাকে ডিজিটাল উপাত্তে পরিণত করা সম্ভব হবে। হাতে লেখা সরকারের নথিপত্র থেকে শুরু করে পুঁথি বা জমির দলিলের লিখিত রূপ পাওয়াটা আমরা সৌভাগ্যের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে পারবো। এছাড়া পাঠাগারকে ডিজিটাল করতে এর কোনো বিকল্পের কথা ভাবা যায় না। সরকারি অফিস-আদালতের নথিপত্র ডিজিটাল করতেও এটি একটি অপরিহার্য হাতিয়ার হতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে এসে অপটিক্যাল কারেক্টার রিডারকে দক্ষ করা কঠিন হওয়া উচিত নয়।

**কথা থেকে লেখা ও লেখা থেকে কথা:** ইংরেজিতে আমরা এই ব্যবস্থাকে টেক্সট টু স্পিচ ও স্পিচ টু টেক্সট বলে গণ্য করি। এর মানে দাঁড়াচ্ছে যে, এই টুলটির সহায়তায় আমরা লিখিত বাংলা শব্দে উচ্চারিত বাংলায় এবং মুখের কথাকে ডিজিটাল লেখায় পরিণত করতে পারবো। এসব কাজেও আমাদের ছোটখাটো গবেষণা রয়েছে। কিন্তু কার্যকর কোনো প্রযুক্তি আমাদের নেই। আমার ধারণা, এই কাজটিকে সমন্বিত করা বা গুছিয়ে নেয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে। গুগল এই খাতেই বেশ কিছু কাজ করেছে। এটি একটি ভালো সিদ্ধান্ত হবে যে, যেটুকু কাজ যারাই করেছেন, সেটুকু কাজকে ভিত্তি হিসেবে নিয়ে টুলটিকে আরও উন্নত করা যেতে পারে। আমার নিজের ধারণা, এই খাতে এখন আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করতে পারি।

**জাতীয় কি-বোর্ড উন্নয়ন:** বিডিএস ১৭৩৮:২০০৪ নামে নিবন্ধিত একটি জাতীয় কি-বোর্ড, সরকার প্রমিত করেছিল। বিজয়-এর দুটি অক্ষর পরিবর্তন করে এই কি-বোর্ডটিকে প্রমিত করা হয়। এটি চারস্তরের কি-বোর্ড যা বর্তমানে ব্যবহারের অযোগ্য। অন্যদিকে এই কি-বোর্ডটিতে বস্তুত বাংলা সকল বর্ণ লেখার বিজ্ঞানসম্মত উপায় নেই। বিশেষ করে পুরনো ও অপ্রচলিত বর্ণ এই কি-বোর্ড দিয়ে লেখা যায়



না। প্রকল্পে এই কি-বোর্ডটিকে সর্বজনের ব্যবহারযোগ্য ও আরও উন্নত করার কথা বরা হয়েছে। এটি যদি না করা হয়, তবে একদিকে রোমান হরফ দিয়ে বাংলা লেখার ব্যবস্থা আরও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হবে, অন্যদিকে দেশটা কি-বোর্ডের জঙ্গলে পরিণত হবে। এই টুলটি হবে, কার্যত বাংলা ভাষার প্রমিত কি-বোর্ড বিডিএস ১৫২০:২০১৮ এবং বিডিএস ১৯৩৫-এর কোডসমূহ অনুসরণ করে বিডিএস ১৭৩৮ কিবোর্ড অনুসারে ডিজিটাল যন্ত্রে বাংলা লেখার ব্যবস্থা করা। একই সাথে অন্যান্য টুলগুলোর সাথে এর সমন্বয়করণ।

**স্টাইল গাইড:** প্রকল্প দলিলে বলা হয়েছে যে, বাংলা ভাষার বিভিন্ন উচ্চারণ, লেখনভঙ্গি, আঞ্চলিক উচ্চারণ ইত্যাদি নানাভাবে বিস্তৃত হচ্ছে। এই অবস্থাতে যদি বাংলা স্টাইল গাইড প্রমিত না করা হয়, তবে বাংলার সংকট বাড়বে। প্রকল্পে সেজন্য স্টাইল গাইড তৈরির প্রস্তাব করা হয়েছে।

**বাংলা ফন্ট ইন্টারঅপারেবিলিটি:** এটি লক্ষ্য করা গেছে যে, কম্পিউটারের বাংলা ফন্টসমূহ নানা ধরনের কোড ব্যবহার করে এবং একটি ফন্টের ডকুমেন্ট অন্য ফন্টে পাঠযোগ্য হয় না। এটি অনেকটা বিভ্রান্তিপ্রসূত। আমাদের ব্যবহারকারীরা আসকি ও ইউনিকোডের পার্থক্য বুঝেন না। আমরা জানি না যে, বাংলার জন্য আসকি কোড আছে, ইউনিকোডও আছে। এমনকি আসকি কোডের প্রকারভেদ আছে। বিজয়-এর ২০০৩ সংস্করণ ও তার পরের সংস্করণের কোড এক নয়। আবার বিজয়-এর কোড ও পশ্চিমবঙ্গের বাংলা আসকি কোড এক নয়। বাংলাদেশে আসকি কোডের মান কার্যত বিজয়। কিন্তু সেটিরও দুটি ভিন্নতা মনে রাখতে হবে। বিজয় ২০০৩ ও তারপরের বিজয়-এর কোডের পরিবর্তনটা বুঝতে হবে। বর্তমানে কনভার্টার ব্যবহার করে এসব সমস্যার সমাধান করা যায়। তবে প্রস্তাবিত এই টুলটির সহায়তায় সকল ফন্টকেই যাতে পাঠযোগ্য করা যায় এবং জটিলতা তৈরি না হয়, সেই আশাবাদ আমাদের রয়েছে।

**সিএলডিআর:** ইউনিকোড কর্তৃপক্ষ বিশ্বের ভাষাসমূহের কমন লোকাল ডাটা রিপজিটরি গড়ে তুলে থাকে। প্রতিটি ভাষা এজন্য ইউনিকোড কর্তৃপক্ষকে সিএলডিআর তৈরি করে জমা দিয়ে থাকে। বাংলায় এমন কিছু তৈরি করা হয়নি বা জমা দেয়া হয়নি। প্রকল্পে সিএলডিআর তৈরি করে তা ইউনিকোড কর্তৃপক্ষকে জমা দেবার কথা বলা হয়েছে। ইউনিকোড কর্তৃপক্ষের সাথে কেবল সিএলডিআরই যুক্ত নয়। ইউনিকোড-এর মানকে বাংলার মানে পরিণত করার জন্য অনেক গবেষণা করারও প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে, এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ির ব্যবহার সম্পর্কে অনেক তথ্য যোগাড় করতে হবে। অন্যদিকে ইউনিকোডে বাংলা রেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে দেবনাগরীকে অনুসরণ করার প্রবণতা রোধ করার জন্য বাংলার ব্যবহারকে গবেষণা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে।

**বাংলা ব্যাকরণ ও বানান শুদ্ধিকরণ:** যারা ইংরেজিচর্চা করেন, তারা জানেন যে, শব্দ ও বাক্যকে শুদ্ধ করে উপস্থাপন করার জন্য কম্পিউটার দারুণভাবে ব্যবহারকারীকে সহায়তা করে। স্পেল বা গ্রামার চেকার এজন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি টুল। কিন্তু বাংলায় আমরা সেই সুযোগটা পাই না। ব্যাকরণ বা বানান শুদ্ধ

করার উপযুক্ত সমাধান এখনও আমাদের হাতে নেই। প্রকল্পে সেজন্য বাংলা বানান ও ব্যাকরণ শুদ্ধিকরণ উন্নয়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

**যান্ত্রিক অনুবাদ:** বাংলা ভাষায় উচ্চতর লেখাপড়া না করার বা বাংলাকে সর্বত্র প্রচলন করার বিষয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যাটির নাম 'অনুবাদ'। প্রকল্পে এমন টুল বা উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে, যার সহায়তায় বাংলার সাথে দুনিয়ার অন্য ভাষাগুলোতে রূপান্তরের বহুমুখী কাজটি সম্পন্ন করা যাবে। বর্তমানে গুগলের অনুবাদক সফটওয়্যার রয়েছে। তবে সেটি মারাত্মকভাবে ত্রুটিপূর্ণ। প্রকল্পের আওতায় একটি ত্রুটিহীন সফটওয়্যার উদ্ভাবন করা হলে আমরা বাংলা ভাষার এক নতুন দিগন্তে প্রবেশ করবো। যেমনি করে বাংলা সাহিত্য দুনিয়ার অন্য ভাষায় অনুবাদ হবে, তেমনি করে দুনিয়ার অন্য ভাষাসমূহের সম্পদ আমরা বাংলায় পেতে পারবো।

**স্ক্রিন রিডার:** আমরা সাধারণ মানুষ চোখে দেখি বলে পড়তেও পারি। কিন্তু ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষদের জন্য দৃশ্যমান মানুষকে সাউন্ডে এবং বিবরণের মাধ্যমে প্রকাশ করে দিয়ে হয়। কম্পিউটারের পর্দাকে পাঠ করার এই ব্যবস্থা ইংরেজিতে রয়েছে। বাংলাতেও এই ব্যবস্থা প্রচলন করার জন্য এই প্রকল্পে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই টুলটি বিশেষত আমাদের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের সফটওয়্যার। ডিজিটাল বাংলা ইশারা ভাষা:প্রকল্পে প্রতিবন্ধীরা যাতে তথ্যপ্রযুক্তিতে আরও সহজে বাংলা ব্যবহার করতে পারে, তার জন্য আরও কিছু সফটওয়্যার উন্নয়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, কেবল দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য স্ক্রিন রিডার সফটওয়্যার নয়, অটিস্টিক মানুষদের জন্য আরও ভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার তৈরি করতে হবে। যদিও এই টুলগুলোকে সরাসরি চিহ্নিত করা হয়নি, তথাপি আমরা যা, কথা বলতে পারে না তাদের জন্য ডিজিটাল ইশারা ভাষা উন্নয়ন করতে পারি। ইশারা ভাষার প্রমিতকরণ একটি বড় কাজ হতে পারে। অনদিকে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য এমন সব যন্ত্র উদ্ভাবন করতে পারি, যা তাদের জীবনযাপন বা চলার পথে বাংলা ভাষায় তথ্য-উপাত্ত বা নির্দেশনা দিতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন 'সাদাছড়ি' বা অন্যান্য ধরনের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের বিষয়ে ভাবা যেতে পারে। আমার জানা মতে, 'সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অব ডিসঅ্যাবিলিটি' নামক একটি প্রতিষ্ঠান ইশারা ভাষা নিয়ে কাজ করছে। তারা এর ডিজিটাল রূপান্তরে সহায়তা করতে পারে।

**বাংলা আবেগ বিশ্লেষণ সফটওয়্যার উন্নয়ন:** এই প্রকল্পে বাংলা ভাষার আবেগ বিশ্লেষণ করার সফটওয়্যার উন্নয়নের প্রস্তাবনা রয়েছে। আমি নিজে অবশ্যই বুঝি না কাজটির মূল লক্ষ্য কি? তবে এটি বুঝতে পারি যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে ভাষা ব্যবহারকারীদের আবেগ ব্যাখ্যা করার জন্য টুলস তৈরি করা এই প্রকল্পের একটি লক্ষ্য হতে পারে। এই বিষয়ে বাংলা ভাষার জন্য কেউ কাজ করেছে তেমনটা আমার জানা নেই।

**বহুভাষিক সার্ভিস প্লাটফরম:** বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং টুল গড়ে তুলে তার সহায়তায় বহুভাষিক উপাত্ত ব্যবহারের জন্য টুল তৈরি করা হবে এই প্রকল্পের



অধীনে। বাংলা ভাষার জন্য এরকম কোনো কাজ কেউ করেছে বলেও আমি জানি না।

**সাইট অনুবাদ:** সরকারের ডিজিটাল রূপান্তরের একটি প্রবণতা হচ্ছে রোমান হরফে বা ইংরেজিতে ওয়েবসাইট তৈরি করা। সেইসব সাইটকে বাংলয় রূপান্তর করা দরকার। এছাড়াও বাংলার জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য বহুল ব্যবহৃত ওয়েবসাইটকে বাংলায় অনুবাদ কর হবে এই প্রকল্পের আওতায়।

**উপজাতীয় কি-বোর্ড:** এই প্রকল্পের আওতায় উপজাতীয় ভাষাসমূহের জন্য প্রমিত কি-বোর্ড গড়ে তোলা হবে। বাংলার জন্য প্রমিত করা কি-বোর্ড-এর ভিত্তিকে বাংলাদেশে প্রচলিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাসমূহের কি-বোর্ড ও সফটওয়্যার এবং ফন্ট তৈরি করা যেতে পারে। এই প্রকল্পে এমন টুলস তৈরি করা যেতে পারে, যার সহায়তায় উপজাতিরা তাদের মাতৃভাষার সাথে বাংলাকে সংযুক্ত করতে পারে। উপজাতীয় ভাষা থেকে বাংলায় এবং বাংলা থেকে উপজাতীয় ভাষায় যান্ত্রিক অনুবাদও এর আওতায় আসতে পারে। উপজাতীয় ভাষাসমূহের জন্য ফন্ট ডিজাইন, বানান শুদ্ধিকরণসহ অন্যান্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা যেতে পারে।

**ধ্বনিতাত্ত্বিক ফন্ট:** বিশ্বের মান অনুসরণ করে বাংলার ধ্বনিতাত্ত্বিক ফন্ট তৈরি করা হবে এই প্রকল্পের আওতায়। যদিও বাংলায় এ ধরনের ফন্টের কাজ কিছুটা হয়েছে, তথাপি এটিকে আরও উন্নত করার জন্য প্রচুর কাজ করতে হবে।

এই টুলগুলোর কথা বলা হলেও বস্তুত আরও অনেক বিষয় এর সাথে যুক্ত হতে পারে এবং আমরা এই প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

এখন প্রযুক্তি আমাদের জন্য বলা হলেও বস্তুত আরও অনেক বিষয় এর সাথে যুক্ত হতে পারে এবং আমরা এই প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করতে পারি।

এখন প্রযুক্তি আমাদের জন্য সুসময় নিয়ে এসেছে। আজকের দিনে আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে রোমান বা ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষাসমূহকেও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা দিতে পারি। আমরা চাইলেই আমাদের নিজেদের সন্তানদের দিয়েই বাংলা ভাষার উন্নয়নে অনেক প্রযুক্তিগত সক্ষমতা তৈরি করতে পারব। আমি প্রকল্পটি গ্রহণ করার পর নানাভাবে নানা স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগ করে দেখেছি যে, তারা অনেকেই নিজেদের মতো করে অনেক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। অনেকে এসব প্রযুক্তি প্রকাশ করতে পারেননি বা তাদের কাজ তারা শেষ করতে পারেননি। এই প্রকল্পের একটি বড় সার্থকতা হতে পারে যে, এই স্বেচ্ছাসেবী জনগোষ্ঠীকে সমন্বিতভাবে বাংলা ভাষার উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারি। আমি লক্ষ্য করেছি যে, কেবল বাংলাদেশ নয় ভারতের পশ্চিমবঙ্গও বাংলা ভাষার উন্নয়নে কাজ করছে। এই প্রকল্পের কাজের সময় তাদের কাজগুলোর কথাও মাথায় রাখা যেতে পারে। আমি একটি কাজের বিবরণ পেলাম যেটা আমাদের কাজগুলোর সাথে সমন্বিত হতে পারে। খড়গপুরের আইআইটি বাংলা 'সার্চ ইঞ্জিন' তৈরির জন্য দু'বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। আমাদের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ও

‘পিঁপীলিকা’ নামে একটি বাংলা সার্চ ইঞ্জিন তৈরি করেছে। দুটিকে সমন্বিত করা যেতে পারে।

সূত্রঃhttp://www.epaper.eismay.com/details.aspxid=31094&boxid=15446419

এই প্রকল্পটি গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ দেবার পাশাপাশি আমি মনে করি যে, এটি বাস্তবায়ন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এতদিন আমাদের শঙ্কা ছিল যে, তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার উন্নয়নে অর্থের সংস্থান হবে কেমন করে? এখন সম্ভবত সেই ভাবনাটি আমাদের ভাবতে হচ্ছে যে, এই কাজগুলো সম্পন্ন হবে কেমন করে। বাংলার ভাষাবিজ্ঞানী ও তথ্যপ্রযুক্তি বিজ্ঞানী উভয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টায় আমরা এই প্রকল্পের সফলতা কামনা করি। ভাষার জন্য রক্ত দেয়া জাতি হিসেবে আমরা কোনোভাবেই এটি সফল হবার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হতে পারি না। আশা করি, তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ প্রকল্পটিকে অন্য দশটি প্রকল্পের মতো বিবেচনা করবেন না। আমি অপ্রিয় হলেও এই কথাটি বলতে চাই যে, অতীতে বাংলা ভাষা নিয়ে যারা কাজ করেছেন, তারা সমন্বিতভাবে সেটি করেননি। যারা কাজ করিয়েছে, তারাও সমন্বিতভাবে কাজটি করাননি। একই কাজ বহুজনে করেছেন। বস্তুত বারবার চাকা আবিষ্কারের ঘটনা ঘটেছে।

জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বাংলা ভাষার এই টুলগুলো উন্নয়ন করার জন্য আমাদের সক্ষমতা কি হতে পারে, তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছি যে, বাংলা নিয়ে কাজ কেবল আমাদের করার বিষয় নয়। এরই মাঝে অ্যাপল, মাইক্রোসফট, গুগল ও ফেসবুকের মতো প্রতিষ্ঠান বাংলা নিয়ে কাজ করছে। তাদের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা সন্দেহাতীত বলেই তাদের উন্নয়ন করা প্রযুক্তিগুলো যদি সরকার সংগ্রহ করতে পারে, তবে অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রকল্পটিতে সহায়তা পাওয়া যাবে। তবে এসব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নিজেদের ব্যবসার বিষয়টি ঠিক রেখে এবং অন্যদের প্রযুক্তিগত সক্ষমতাকে প্রতিযোগিতার কোন স্তরে দেখবেন, তার ওপরে নির্ভর করবে যে, তারা এই প্রকল্পে কতোটা সহায়তা করবে। তবে তাদের কর্মকাণ্ড থেকে এই কথাটি খুব সহজেই বলা যায় যে, বাংলা ভাষাভাষী বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রতি এইসব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নজর পড়েছে। তারাও চাইছে তাদের প্রযুক্তিতে যেন বাংলা ভাষার ব্যবহার সহজ হয়। আমরা এটাও জানি যে, এটুআই-এর সহায়তায় ইউনাইটেড বিশ্ববিদ্যালয়, আইআরডিসির সহায়তায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারের সহায়তায় টিম ইঞ্জিন ওসিআর ও অন্যান্য প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করেছে। এরই মাঝে আমি আরও অনেককে এসব প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন বলে দাবি করতে জেনে আসছি। আমি আশা করবো, তারা সবাই মিলে বাংলা ভাষার প্রযুক্তিগত সক্ষমতার বিষয়টি ইংরেজির সমকক্ষ স্তরে উন্নীত করতে পারবেন।

তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের আলোচিত প্রকল্পের আওতায় মোট ষোলোটি টুলের কথা বলা হলেও বস্তুত এর পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে। কারণ প্রতিবন্ধী বা উপজাতীয় উভয় শ্রেণিতেই একাধিক টুল উন্নয়ন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আবার বাংলার জন্য উন্নয়ন করা টুলগুলোর বেশ কটি উপজাতীয় ভাষার জন্যও করা যেতে পারে।



এই টুলসগুলো কয়েকটি হয়তো প্রথাগত– তবে অনেকগুলোতেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা বিগ ডাটা বিশ্লেষণের মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

**প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্থা:** সরকারের এই প্রকল্পটির সর্বশেষ অবস্থা হচ্ছে যে, ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ নামক একজনকে এই প্রকল্পের পরিচালক পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। কিছুদিনের মাঝেই তিনি বদলি হয়ে যান এবং বিসিসির জনাব গোলাম সারোয়ার পিডি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ইতোমধ্যে প্রকল্পের জনবল ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে।

গত ৮ জুন ১৭ সকাল ১১টায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সভাকক্ষে এই প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রথম সভা কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক স্বপন কুমার সরকার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতি এবং আমিতো উপস্থিত ছিলাম আরও উপস্থিত ছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ড. জিনাত ইমতিয়াজ আলী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের (সাবেক) পতিনিধি সুশান্ত কুমার সরকার, বুয়েটের প্রতিনিধি মো. মনিরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমির প্রতিনিধি অপরেশ কুমার ব্যানার্জি ও প্রকল্প পরিচালক নিজে। প্রকল্পের তখনকার অবস্থা সম্পর্কে সভার কার্যপত্রে বলা হয়: ইতোমধ্যে প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ক. প্রকল্পের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তির বরাদ্দ পাওয়া গেছে। খ. সরাসরি পদ্ধতিতে ০২ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং ০১ জন হিসারক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। গ. ৭টি পদে কনসালট্যান্ট নিয়োগের মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ৭টি পদে প্রাকচুক্তি নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে। অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। ঘ. মূলধন খাতে আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। যন্তপাতি ক্রয়ের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন চলছে। ঙ. গত ১৫ মে ২০১৭ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চ. গত ২৪ মে ২০১৭ তারিখে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় এটি জানানো হয় যে, প্রকল্পটিকে ৪ ফেব্রুয়ারি ১৭ প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ৮ জুনের সভায় সফটওয়্যারের স্পেসিফিকেশন ও মূলায়ন নিরূপণের দুটি আলোচ্যসূচি থাকলেও বস্তুত একটি কারিগরি কমিটি গঠন করে প্রকল্পের টুলগুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১১ জুনের মাঝে কমিটির সদস্য কারা হবেন, তার নামগুলো বিশেষজ্ঞরা দেবেন বলেও সিদ্ধান্ত হয়। তবে সভার পর কমিটির সদস্যরা মতামত প্রকাশ করেন যে, এই বিষয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে, যাতে সংশ্লিষ্টরা অংশ নিতে পারে। বিশেষজ্ঞ কমিটির সভায় ড. জাফর ইকবাল, ড. জিনাত ইমতিয়াজ আলীসহ আমরা সবাই এই প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। আমরা এই প্রকল্পটির সফলতার মধ্য দিয়ে প্রযুক্তি বাংলা ভাষার এক নতুন সম্ভাবনাকে দেখতে পেলাম। বিশ্বের অন্য ভাষাগুলোর তুলনায় আমাদের ভাষার প্রযুক্তিগত সমৃদ্ধিকরণ আদৌ না হবার ফলে এটি হয়ে দাঁড়িয়েছে একমাত্র সুযোগ; যার ভিত্তিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সারাবিশ্ব জয় করবে।

২৪ জুন ১৭ আয়োজিত কর্মশালাটি বস্তুত জনসমক্ষে প্রকল্পটির প্রথম আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ। ঐদিন সকাল সাড়ে ৯টায় নিবন্ধনের সূচনা হয়ে কর্মশালাটি বেলা ২-২৩ মিনিটে সমাপ্ত হয়। কর্মশালার মোট তিনটি পর্ব ছিলো। প্রথম পর্বটি উদ্বোধনী। এতে সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সাবেক অতিরিক্ত সচিব সুশান্ত কুমার সাহা। বিশেষ অতিথি ছিলেন কবি কাজী রোজী এমপি। সূচনা পর্বে প্রকল্প পরিচালক ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন এবং প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। কর্মশালাটি জনাব মুনির হাসান সমন্বয় করেন। দুটি কারিগরি অধিবেশনের প্রথমটি শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল সঞ্চালনা করে। দ্বিতীয়টি সঞ্চালনা করি আমি নিজে। প্রথমটিতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চৌধুরী মফিজুর রহমান এবং সৈয়দ আশরাফ আহমদ। দ্বিতীয়টিতে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন প্রফেসর দানিউল হক ও সামির ইসলাম। কর্মশালায় যেসব প্রস্তাবনা পেশ করা হয় তার মূল সুরটা ছিল, কেবল বাংলাদেশ নয়, সারা দুনিয়াতে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা নিয়ে যিনি বা যারাই কাজ করেছেন, তাদের সকলের কাজকে বিবেচনায় নিয়ে সমন্বিত করে কাজ করা উচিত। সকলেই এটি স্বীকার করেন যে, এই প্রকল্পটি চ্যালেঞ্জিং। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিও প্রত্যাশা করেন সবাই। প্রকল্প যে বাস্তবায়নের পথে তার আরও একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে যে, গত ৪ আগস্ট ১৭ দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক কালের কণ্ঠ ও দৈনিক ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকায় প্রকল্পের চারটি টুল ১. আইপিএ ফন্ট সফটওয়্যার, ২. জাতীয় কি-বোর্ড সফটওয়্যার, ৩. ব্যাকরণ ও বানান শুদ্ধিকরণ এবং ৪. স্ক্রিন রিডার সফটওয়্যার উন্নয়নের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

অন্যদিকে ১০ আগস্ট ১৭ সকাল ১১টায় প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ কমিটির একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ছাড়াও যেসব ইওআই প্রকাশ করা হয়েছে, সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় আমেরিকান কোম্পানি নোয়াঙ্গ-এর পক্ষ থেকে বাংলা কি-বোর্ড ও প্রাসঙ্গিক কাজের জন্য দেয়া প্রস্তাব নাকচ করা হয়। সভায় ইওআই প্রকাশের আগে বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত নেবার বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়। সভার অন্য এক সিদ্ধান্তে প্রকাশিত ইওআই-এর সংশোধন করার ও ইওআই গ্রহণের সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। অন্যদিকে ১৩ আগস্ট ১৭ আহ্বানকৃত ইওআই এ প্রিবিড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় সংশোধনী ও সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ প্রথম চারটি টুলের ইওআই জমা দেবার সময় নির্ধারিত ছিল। তবে চলতি বছরের মে মাসে এই প্রকল্প একটি চলমান গতি পেয়েছে। সবকটি টুলের ইওআই প্রকাশ করা ছাড়াও বেশ কটি টুলের আরএফপি জমা, মূল্যায়ন ও অন্যান্য কাজ চলমান।



## হায়াৎ মামুদ

# কী ভুল লিখি কেন লিখি

খুব মোটা দাগের একটা কথা আমরা বুঝাতে চেয়েছি: বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে আমাদের পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। এই কথার মধ্যেই আরো একটা সংবাদ লুকানো আছে, তা হল- যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা এতই কম যে, প্রায় তা অপরিচয়ের শামিল। যাক, যুক্তব্যঞ্জন ইত্যাদি বিষয়ে পরে আরো অনেক কথা বলতে হবে। তাই এখন অন্য প্রসঙ্গে আসি।

বাংলা লিখতে গিয়ে কোন কোন ধরনের ভুল হয় সেটা শনাক্ত করা যাক। ভুল হয়:

ক. বানানের ক্ষেত্রে।

খ. বাক্যে ব্যবহৃত শব্দাবলি নির্ভুল লেখার ক্ষেত্রে।

(যেমন, কী বলতে চাই তার ওপর নির্ভর করে অনেক সময়ে সংযুক্ত শব্দ লিখতে হয়; কখন শব্দ আলাদা-আলাদা বসবে, আর কখন জোড়া লাগবে- সাধারণ মানুষজন তো দূরের কথা, বাংলার শিক্ষকও অনেকে জানেন না)।

গ. বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে।

ক. স্বল্পশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত যাঁরাই বাংলা লিখতে গিয়ে বানান ভুল করেন, আমাদের বিবেচনায়, প্রধানত তার জন্য দায়ী এ ক'টি কারণ:

১. হয়তো ঐ বিশেষ শব্দের বানানটি কখনোই মন দিয়ে শেখা হয়নি।

২. বানানের দিকে একেবারেই মনোযোগ না-দেওয়া। মনোভাবটা এ-রকম যে, আমার মাতৃভাষা আমার যেমন খুশি তেমন লিখব, শুদ্ধ না-হয়ে যাবে কোথায়? স্পষ্টতই, একেবারে মূঢ়তার চূড়ান্ত।

৩. বানান সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলেও অভিধান খোলার কষ্ট স্বীকার না করা। বলা প্রয়োজন, অভিধান দেখা অনেকটাই অভ্যাসের ব্যাপার; ছোটবেলা থেকে রপ্ত না হলে পরবর্তীকালে ভারি ঝক্কি মনে হয়।

৪. মুখে যেমন বলি, ঠিক তেমনি উচ্চারণের বানান লেখা। এটা বিশুদ্ধ জ্ঞানপাপীদের লক্ষণ, শিক্ষিত লোকেরাই এই স্বেচ্ছাচার বেশি করেন এবং এঁদের মধ্যে কবি-সাহিত্যিক-অধ্যাপক সবাই কমবেশি আছেন। এ ধরনের বানানের নমুনা হচ্ছে-গ্যালো, য্যানো, বোললো, কএকটা।

৫. কোনো শব্দ ভুল উচ্চারণের অভ্যাস থাকলে লিখতে গিয়ে অশুদ্ধ উচ্চারণের প্রভাবে ভুল বানান লেখা হয়। যেমন, অনেকেই বলেন অধীনস্ত, মুখস্ত, অভ্যস্থ, বিপদগ্রস্থ, ভূমিষ্ট, ঘনিষ্ট, মুষ্ঠি এবং লেখেনও তাই। অথচ শব্দগুলো হবে অধীনস্থ, মুখস্থ, অভ্যস্ত, বিপদগ্রস্ত, ভূমিষ্ঠ, ঘনিষ্ঠ, মুষ্টি।

উপরের কারণগুলোর ভিতরে সবচেয়ে বিপজ্জনক ২য়, ৩য় ও ৪র্থটি। এর সব ক'টিই অবিনয়ী, অহঙ্কারী, মেধাহীন। শুধু জানার আগ্রহ ও মাতৃভাষাপ্রেম থাকলেই এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ। বানান ঠিক-ঠিক জানার জন্যে বা মনে রাখার জন্যে দু-চারটি ছোটখাটো নিয়ম আছে, সেগুলো মোটেই শক্ত নয় এবং বেশির ভাগই খুব মজার। সেই সহজ কৌশলগুলো জেনে নিলেই তো হয়। আর তা জানাবার জন্যই তো এত সাতকাহন কথা।

এখানে ছোট্ট একটা গল্প বলে নেই। গল্পও নয়, সত্যি ঘটনাই। বাংলা ভাষায় 'বৌ' বানান পাল্টে দিয়ে যখন 'বউ' মুদ্রিত হরফে হেথা-হোথা বেরুচ্ছে, তখন অনাচার দেখে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার নাকি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। বলেছিলেন: 'ছিঃ ছিঃ, শেষ পর্যন্ত বৌ হল এমন! বৌ তো বউয়ের মাথায় ঘোমটা কই?'

আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটি যতখানি পরিহাসের, বস্তুত ততখানি নয়। বক্তা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেই হয়তো বাংলা ভাষার লেখ্যরূপের গড়ন নিয়ে অমন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সত্য উক্তি করতে পেরেছিলেন। ভিতরের বাণীটি এই যে, অক্ষর বা বর্ণের পিছনে দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপের আভাসও কাজ করে। হঠাৎকে ইচ্ছে হলেই কি আমরা 'হঠাত' লিখতে পারি? বৌ- এর যেমন ঘোমটা লাগে, তেমনি হাত পিছলে আচমকা পড়ে যাবার জন্যে ৎ দরকার যে। অনুস্বারের (ং) চেহারাটাই এমন যে স্কুল-বারান্দায় কাঁসরঘণ্টা ঝুলছে যেন, অপেক্ষা শুধু পাশে ঝুলানো কাঠিটি তুলে নিয়ে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়া। গোল গোল চোখ করে যে তাকিয়ে থাকে, আঃ উঃ দীর্ঘশ্বাস না ফেলে তার উপায় আছে? এ সবের অর্থ তো এটাই যে, শুধু উচ্চারণ বা অর্থই নয়, বানানে ছবিটাও জরুরী। উপরন্তু, বানানের জন্মপরিচয় ও ইতিহাস আছে। পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষা নেই যা উচ্চারণ অনুযায়ী হুবহু লেখা হয়। লেখা যে হয় না তার কারণ, বানানের মধ্যে তার বংশপরিচয় লুকিয়ে থাকে, বানানে অনাচার ঘটলে ঐ পরিচয়টি হারিয়ে যায়।



'উজ্জল্' এবং 'সংগা' উচ্চারণমাত্র আমরা বুঝতে পারি এদের অর্থ, কিন্তু লিখবার সময়ে যতক্ষণ না 'উজ্জ্বল' বা 'সংজ্ঞা' লেখা হচ্ছে, ততক্ষণ বুঝতে পারি না এই দুটি শব্দ কী বলতে চায়। 'উজ্জ্বল'র সঙ্গে যে জ্বলে ওঠার সম্পর্ক, সম্পর্ক আগুনের, দীপ্তির- তা কেমন করে বুঝবো যদি না এর আড়ালে জ্বলনের ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পারি? জ্বলা আর জলা কি এক? জ্বলনের ব-ফলা তাই উজ্জ্বলে লাগবেই। 'সংজ্ঞা' শব্দের বানানটিই তো বলে দিচ্ছে যে, এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই সঙ্গদানের বা একসঙ্গে থাকার; 'জ্ঞা' অক্ষরটিই ইশারা দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে 'জ্ঞান'কে। সংজ্ঞা ফিরে এল মানে চেতনাহীনের জ্ঞান ফিরে এল; আমরা সংজ্ঞা হারাই অথবা ফিরে পাই।

বানান ভুল না-করার, বানান মনে রাখার কিংবা লিখবার সময়ে সন্দেহ দেখা দিলে এই হচ্ছে আরেকটি চমৎকার চাবিকাঠি: শব্দটি কীভাবে তৈরি হয়েছে মাথা খেলিয়ে তা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চালানো। ধরুন- 'ভূগোল' শব্দের বিশেষণ শতকরা নব্বইজন লেখেন 'ভৌগলিক'। অথচ, এই বানান ভুল। ভুলটা ধরে ফেলাও কিন্তু সহজ। মূল শব্দে, মানে বিশেষ্য পদটিতে তো গ-য়ে ও-কার ছিল, তাহলে বিশেষণে গো না হয়ে গ কেন হবে? অবশ্যই হবে 'ভৌগোলিক'। অথবা ধরা যাক, খুব পরিচিত ও অতিব্যবহৃত তিনটি শব্দ:

গীতাঞ্জলী, পুষ্পাঞ্জলী, শ্রদ্ধাঞ্জলী। তিনটিরই বানান ভুল এবং প্রায় সবাই এই ভুল বানানই লেখেন। অথচ 'অঞ্জলী' বানান কিন্তু তাঁরাই আবার শুদ্ধ লিখছেন। মজার ব্যাপার হল- গীত+অঞ্জলি, পুষ্প+অঞ্জলি এবং শ্রদ্ধা+অঞ্জলি মিলে যে গীতাঞ্জলি/পুষ্পাঞ্জলি/শ্রদ্ধাঞ্জলি হয়েছে, তা তাঁদের চোখ এড়িয়ে যায়।

কিংবা ধরুন, অনেকেই লেখেন 'জুগিয়েছে' (যেমন, সে তার ভাইয়ের ব্যবসার টাকা জুগিয়েছে)। শব্দটি যে ভুল তা অল্প বিবেচনাতেই ধরা পড়ে: যোগ/যোগানো/যোগান দেওয়া এই শব্দের সঙ্গে ধ্বনিগত মিল আর অর্থগত মিল (যোগ করা, যুক্ত করা) বুঝতে অসুবিধে হয় না। অতএব, 'যুগিয়েছে' না লিখে উপায় কী?

খ. বাক্যে আমরা যখন শব্দ ব্যবহার করি, তখন কখনোই এলোমেলোভাবে করি না, কারণ তাহলে অর্থই বোধগম্য হবে না। তার মানে বাক্যের ভিতরে শব্দের অবস্থান (অর্থাৎ কোনটা কার পাশে বসছে, আগে বসছে না পরে বসছে, দূরে বসছে না কাছে ইত্যাদি) একটা জরুরি ব্যাপার। বাংলা যেহেতু মাতৃভাষা, তাই- লেখাপড়া কমই জানি আর বেশিই জানি- বাক্য মোটামুটি শুদ্ধভাবে বলার কায়দা রপ্ত হয়ে যায়। মুশকিল বাঁধে লিখতে গেলে। লেখায় ত্রুটি ঘটলে বক্তব্য বুঝতে অসুবিধে হবেই। মুখে কথা বলার সময়ে ভুল-চুক যদি হয়ও তত এসে যায় না; কারণ, কিছু যখন বলি তখন কণ্ঠস্বরের ধরন মুখ-চোখের ভঙ্গি ইত্যাদি সহযোগিতা করে বাক্য গঠনের ত্রুটি শুধরে দেয়।

নিচের বাক্যগুলো লক্ষ্য করলে আমাদের বক্তব্য বুঝতে সুবিধে হবে:

১. ভদ্র লোক মাত্রেই সজ্জন হয়।
ভদ্রলোককে আমি চিনি না।

২. তাঁর লক্ষ্য যোগ্যপাত্রের হাতে কন্যাকে তুলে দেওয়া।
কন্যার বিবাহের জন্য তিনি লক্ষ্যযোগ্য কোনো পাত্রই খুঁজে পাচ্ছেন না।
৩. স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ বিমান কর্মীদের তালিকা [অর্থহীন বাক্য]
স্বাধীনতাযুদ্ধে শহিদ বিমানকর্মীদের তালিকা।
৪. দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আসে না, শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে অর্জিত হয়।
দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন, জাতি কখনো তাঁদের ঋণ শোধ করতে পারবে না।
৫. আমার পক্ষে তোমার এই ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। ঋণশোধ তো মুখের কথায় হয় না, সে জন্য স্বার্থত্যাগ করতে হয়।
৬. বিরোধী দলীয় নেতারাই নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করে এভাবে দল ভাঙেন। বিরোধীদলীয় নেতারা সবসময়ে সরকারি দলের উল্টো কথা বলেন।
৭. ধূমপান মুক্ত এলাকায় করা উচিত, বদ্ধ ঘরে নয়।
এই স্থান ধূমপানমুক্ত এলাকা।
উপরের জোড়বাক্যগুলো মন দিয়ে পড়লেই বুঝা যায়, সংযুক্ত শব্দ আর বিযুক্তশব্দ বাক্যের অর্থ কী পরিমাণ পাল্টে দিতে পারে। কখন একটা শব্দের সঙ্গে আরেকটা জোড়া লাগবে আর কখন লাগবে না তারও নিয়মকানুন আছে।
অনেককে দেখেছি- গুলি/গুলো কিংবা খানা/খানি আলাদা লেখেন; অথচ আলাদা তো হবে না। এ-রকম আরো ত্রুটিবিচ্যুতি আছে যাতে বানান ভুল নয়, শব্দ তৈরিতে ভুল হয়।
গ. বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ভুলই হয় অসতর্কতার কারণে। শুনে আশ্চর্য লাগবে কিন্তু কথাটা নির্জলা সত্যি: অত্যন্ত শিক্ষিত বাঙালিও, এমনকি যাঁরা সাহিত্যচর্চা করেন তাঁরা পর্যন্ত অসতর্কতার ফলে ভুল বাক্য লেখেন। এখানে আমরা কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছি কোনো-না-কোনো মুদ্রিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ থেকে বেছে নেওয়া।
১. একই আয় বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে তুলনা করলে শিশুশ্রম ব্যবহারে পার্থক্যের কারণ হল পারিপার্শ্বিক ও পারিবারিক পরিবেশ। (অশুদ্ধ)
...তুলনা করলে দেখা যাবে শিশু-শ্রম...। (শুদ্ধ)
২. এমন অবস্থার শিকার হতে হয় যেহেতু তাদের ছেলে-মেয়ে উচ্চমানের ছাত্র নয় কিংবা তারা ততটা মনোযোগী হতে পারে না বলে। (অশুদ্ধ)
.... মনোযোগী হতে পারে না। (শুদ্ধ) [পূর্বে 'যেহেতু' থাকায় 'বলে' হবে না]
৩. ছাত্রদের মধ্যে যে সহিংস তৎপরতা চলছে, অস্ত্রের যে ব্যবহার হচ্ছে তার সরাসরি এবং পরোক্ষ দুই ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা আসছে এমন জায়গা থেকে যেখানে অর্থ, অস্ত্র এবং সেগুলি ছাত্রদের মধ্যে সরবরাহ ও ব্যবহার করার সাংগঠনিক (এবং প্রশাসনিক) ব্যবস্থার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নেই। (অশুদ্ধ)
.... যেখানে অর্থ, অস্ত্র ছাত্রদের মধ্যে সরবরাহ....। (শুদ্ধ) 'এবং সেগুলি' শব্দ দু'টি একেবারেই অপ্রয়োজনীয়, ও অর্থবিভ্রাট ঘটাচ্ছে।]



অথবা
... যেখানে অর্থ, অস্ত্র মজুদ থাকে এবং সেগুলি ছাত্রদের মধ্যে সরবরাহ...।
৪. কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়গুলোতে কী পড়ানো হয়, তা নিয়ে অনেকের মাথাব্যথা থাকলেও শিশুদের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, যা শিশু শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কষ্টকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন খুব কমসংখ্যক ব্যক্তি। (অশুদ্ধ)
... শিশুদের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, যা শিশু-শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কষ্টকর উদ্যোগ গ্রহণ, করতে এগিয়ে আসেন...।
(শুদ্ধ) [কমার বদলে দু'জায়গাতেই ড্যাশ দেওয়া যায়, অথবা কমা/ড্যাশ বাদ দিয়ে 'যা' থেকে 'উদ্যোগ গ্রহণ' শব্দসমূহ প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রাখা]
৫. ঘরটা রাখতে হবে সার্বক্ষণিক পরিচ্ছন্ন। (অশুদ্ধ)
ঘরটা রাখতে হবে সার্বক্ষণিকভাবে পরিচ্ছন্ন। (শুদ্ধ)
উপরের পাঁচটি উদাহরণেই যে-ধরনের ভুল করা হয়েছে, তাতে কিন্তু প্রমাণ হয় না যে, এই লেখকেরা বাংলা জানেন না বা খারাপ জানেন। সব ক'টি ভুলই ঘটেছে অসতর্কতার কারণে, বাক্যগঠনের ব্যাপারে সাবধানী না-হওয়ার জন্য।

আহমদ রফিক

# স্বাধীন স্বদেশে মাতৃভাষা-রাষ্ট্রভাষা নিয়ে কথা

বাঙালি মুসলমান সমাজে মাতৃভাষা, ব্যবহারিক ভাষা নিয়ে প্রশ্ন, দ্বিধা, সংশয় দীর্ঘদিন থেকে ছিল। শেষপর্যন্ত অবশ্য মধ্যযুগীয় মুসলমান কবিগণ তাঁদের সাহিত্যকর্মের মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা বংলার গুরুত্ব অনুধাবন করেন, মেনেও নেন।

ইংরেজ শাসিত ভারতের বঙ্গীয় মুসলমান বিশ শতকের প্রথমদিকে ধর্ম ও ধর্মীয় ভাষা নিয়ে রক্ষণশীলতার পরিচয় কম রাখেনি মুসলমান-পরিচালিত কিছুসংখ্যক পত্র-পত্রিকায়। বিশ শতকের আধুনিকতা তাদের চেতনায় যুক্তিবাদী মুক্তচিন্তার আলো জ্বালেনি। মাতৃভাষা বাংলা নিয়ে বাঙালি মুসলমানের বড়সড় অংশের মনে ছোট-বড় নানা উপলক্ষে তৈরি বাধাগুলো ভেঙে ফেলে একুশে ফেব্রুয়ারির (১৯৫২) ভাষা আন্দোলন।

এর প্রভাব পড়ে পাকিস্তানি আমলের পূর্ববঙ্গে সাহিত্য ও রাজনীতিচর্চার ক্ষেত্রে। সে প্রভাব বাহান্ন-উত্তর সময়ে ব্যাপক হলেও শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের শ্রেণি স্বার্থ যে এর ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে সুবিচার করেনি, তার প্রমাণ ধরা রয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে শাসকশ্রেণির বাংলাভাষার প্রতি অযৌক্তিক উদাসীনতায়, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, আদালতের রাজকার্যে। সেখানে ঔপনিবেশিক রাজভাষা ইংরেজির একাধিপত্য। বাংলা সেখানে ঘরছাড়া অবস্থায়।



কিন্তু যতদিন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে বাংলা ভাষা ও বাঙালির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লড়াই চলেছে, ততদিন মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা শিক্ষিত বাঙালি মানসে ক্ষুণ্ন হয়নি। এক্ষেত্রে বাঙালি বলতে বাঙালি মুসলমানের কথাই বলা হচ্ছে। তখন বাংলাভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা ছিল বাঙালির চেতনায় গৌরবের ও গর্বের বিষয়।

কিন্তু আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক শ্রেণিস্বার্থের এমনই শক্তি যে নিরাপদ, অনুকূল পরিবেশে ক্ষমতার বাড়বাড়ন্ত তার পূর্ব-অঙ্গীকার অস্বীকার করতে বাঁধেনি। রাষ্ট্রভাষা বাংলা, সর্বস্তরে বাংলার ব্যবহার নিয়ে এমনই এক নিদারুণ স্ববিরোধিতার পরিচয় রেখেছে আমাদের শাসকশ্রেণি স্বাধীন বাংলাদেশে। তাই পুনরুক্তি সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে, ভাষিক জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশে বাঙালি শাসকশ্রেণির কল্যাণে উচ্চশিক্ষা ও উচ্চ আদালতের ব্যবহারিক ভাষা বাংলা নয়, ঔপনিবেশিক রাজভাষা ইংরেজি।

এর ধারাবাহিকতা এতটাই যে, যতই দিন যাচ্ছে সমাজের বিভিন্ন খাতে পূর্বতন রাজভাষা ইংরেজির প্রচলন ততই বাড়ছে এবং তা মূলত শিক্ষাঙ্গনে সরকারি, বেসরকারি উভয় খাতে, এবং তা সরকারি সমর্থনে এবং সংবিধানের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক ধারা লংঘন করে।

সেই পরিস্থিতিতে সমাজে ইংরেজির ব্যাপক ব্যবহার থাকুক না তাতে অশুদ্ধতা বা মননশীলতার বা পরিশীলিত চর্চার অভাব। কথকতায় বাংলা-ইংরেজির মিশ্রণ এক উদ্ভট সাংস্কৃতিক সংকটের পরিচয় বহন করছে। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি। পূর্বপ্রসঙ্গে বলতে হচ্ছে, শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা বিতাড়নের আপাত শেষ উদাহরণ 'ইংলিশ ভার্সন' নামীয় শিক্ষা বিষয়ক উপদ্রব। সর্বোপরি জীবিকার ভাষাও হয়ে ওঠেছে রাষ্ট্রভাষা বাংলা নয়, বিগত ঔপনিবেশিক রাজভাষা ইংরেজি।

**দুই.**

স্বাধীন বাংলাদেশে মাতৃভাষা বাংলার এহেন বহুমাত্রিক দুর্দশা, দুরাবস্থার বিষয়টি পাকিস্তানি আমলে কারো কল্পনায় ছিল না। স্বাধীন বাংলাদেশে শাসক ও তাদের সমপর্যায়ের সামাজিক শ্রেণিগুলোর যেমন পেশাজীবী ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সামরিক বাহিনী প্রভৃতির স্বার্থপূরণের ব্যবস্থা পাস হওয়ার পর ঔপনিবেশিক রাজভাষা ও তার ভাষিক সংস্কৃতি পূর্ণ দাপটে পূর্বাবস্থায় ফিরে এলো ইংরেজ শাসনামলের শিক্ষিত শ্রেণির সংস্কৃতি নিয়ে। এলো পাকিস্তান আমলের ইংরেজি মহিমা।

এর ফলে বাংলা যে শুধু বাঙালির সাহিত্যের ভাষা, তার দৈনন্দিন মুখের ভাষা হয়ে থাকলো তাই নয়, সেই ভাষা শিক্ষার প্রতি অবহেলা ও উদাসীনতা আমাদের মজ্জাগত হয়ে দাঁড়ালো। এ অবস্থা সমাজের সর্বস্তরে। তাই বাংলাভাষার নির্ভুল ব্যবহার উচ্চারণে, বাণিজ্যিক লেখায় অনেকটা অধরা হয়ে ওঠেছে সর্বমাত্রিক অশুদ্ধতার দাপটে। সে অশুদ্ধতা নানামাত্রিক। এফ এম বেতারে বাংলার অবমাননা নিয়ে আদালতে যাওয়া চলতে পারে। সে এক অনাচার।

যা দেখা যায় বিজ্ঞাপনে, সাইনবোর্ডের ভুল বানানে, শব্দের ভুল ব্যবহারে, টিভি'র কথকতায়ও ইংরেজি-বাংলার উদ্ভট মিশ্রণে। এককথায় শিক্ষিত শ্রেণিতে বাংলাভাষার ব্যবহারে বাঙালির উদাসীনতা, শুদ্ধতার অভাব, নৈরাজ্যিক প্রভাব

প্রকট। ফলে ধারণা হতে পারে বাংলা বাঙালির জীবনে রাষ্ট্রভাষা-জাতীয় ভাষা নয়, সে নিতান্তই দ্বিতীয় ভাষা, যার পরিচর্যায় সময় না দিলেও চলে। চলে ঘটা করে প্রতি ফেব্রুয়ারিতে 'মহান একুশে' পালন। যেমন শহিদ দিবসে শহিদ মিনারে তেমনি গোটা ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে বাংলা একাডেমিতে সাহিত্যিক অনুষ্ঠানমালায়।

ভাষার মাস ফেব্রুয়ারিকে বিদায় দিয়ে বছরের বাকি এগারো মাস বাংলাদেশের শিক্ষিত শ্রেণি বাংলাভাষাকে নিয়ে অনাদরে অবহেলায় সময় কাটায়। একুশের দায় পালনে সব শেষ। ভাষার নানামাত্রিক ব্যবহারে আন্তরিকতা ও মননশীলতার অভাব বড় হয়ে দেখা দেয়। তাই বাংলা শব্দের বানানরীতি নিয়ে মতভেদ এখনো দূর হয়নি। বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রবর্তিত প্রমিত বাংলা বানানরীতি এখনো প্রশ্নবিদ্ধ, কোনো কোনো খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ বা ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে তা অগ্রহণযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে– দীর্ঘ উচ্চারণের ক্ষেত্রে এবং বিদেশি শব্দের বানান ব্যবহারে।

দীর্ঘ উচ্চারণ বাংলায় সচল নয়, এ যুক্তিতে দীর্ঘ ঈ বর্জনে সুবিধাই বা কী, লাভই বা কী। 'তীর' শব্দটিকে 'তির'-এ পরিণত না করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত, কিংবা 'শ্রেণী'কে 'শ্রেণি' বানানে টেনে এনে। আমার কথা হলো 'তীর' বা 'শ্রেণী' এবং অনুরূপ দীর্ঘ ঈ যুক্ত বানান কি কোনো অসুবিধা তৈরি করছিল শিক্ষিত শ্রেণির ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে?

তাছাড়া ইংরেজি শব্দে যেখানে দীর্ঘ বানান যেমন Greek, League, এগুলোর মূল বানান অস্বীকার করে ডানা কাটার পেছনে কী ভাষিক স্বার্থ উদ্ধার হয়েছে? এসব শব্দের বাংলারূপ 'গ্রীক' বা 'তীর' থাকলে কি ভাষাবিজ্ঞানের খুব একটা ক্ষতি হতো? এ প্রসঙ্গে যে সমতার কথা বলা হয়েছে, তা কি সর্বত্র রক্ষা করা গেছে? তাহলে কেন আনন্দবাজারী নব্যরীতি অনুসরণ?

আরো একটি বিষয় বিবেচ্য। আজকাল সাহিত্যের ভাষা ও শব্দ ব্যবহারে, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে আঞ্চলিকতার যে প্রবণতা প্রধান হয়ে ওঠেছে, তাতে কি প্রমিত বাংলার ভাষিক ও শাব্দিক মানমর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হবে? এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো প্রমিত বাংলারীতি কি বাংলা ভাষার বানান সমস্যার পুরোপুরি সমাধান করতে পেরেছে? এখনো একাধিক শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ বা অধ্যাপক-সাহিত্যিককে নিজ পছন্দমতো বানান ব্যবহার করতে দেখা যায়।

তিন.

বাংলার ভাষিক ব্যবহারে এই যে প্রমিত বাংলার আধিপত্য, অন্যদিকে ভাষিক নৈরাজ্য (যেমন দরজা= দরোজা, নরম=নরোম ইত্যাদি), এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে দীর্ঘ ঈ'র ব্যবহার যে বিভেদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, তার সুষ্ঠু সমাধান কি সম্ভব হবে? আরো একটি কথা, প্রমিত বানানরীতির সংস্কারের যাত্রাপথে কোনো কোনো প্রভাবশালী সংবাদপত্র তো নিজস্ব বানানরীতির পক্ষে পুস্তিকা প্রকাশ করে সেই পথ ধরে চলছে। তেমন সব ক্ষেত্রে সমতা আসবে কীভাবে?

এবার ভাষা প্রসঙ্গে একটি ভিন্ন বিষয় বিচার-ব্যাখ্যার দাবি রাখে। বিস্ফোরক, জনপ্রিয় ভাষাআন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রভাষার



মর্যাদাব্যঞ্জক অনুচ্ছেদ সত্ত্বেও এই যে সর্বত্র ঔপনিবেশিক বিদেশি ভাষার ব্যাপক বংশবিস্তার এবং শিক্ষিত সমাজে জীবন-জীবিকায় এর পেছনে এককাট্টা সমর্থন, এর নেপথ্য কারণ কী হতে পারে?

তা কি শুধু শিক্ষিত শ্রেণির অনুসৃত বিদেশি ভাষিক সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষা, শ্রমসাধ্য পরিবর্তনে অনীহা, নাকি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতি আনুগত্যে ঔপনিবেশিক আমলের দাস মনোভাব অনুসরণ? কোনটা বাঙালি শিক্ষিত মানসের স্ববিরোধী আচরণের নেপথ্য কারণ? যে কারণে বাঙালির একসময়কার ভাষিক-জাতীয়তা ভিত্তির পর্ব ও অহংকার আত্মগ্লানির প্রকাশ না ঘটিয়েই উধাও হয়ে গেছে। অবশ্য আনুষ্ঠানিকতার বহিরঙ্গটুকু যথারীতি পালিত হচ্ছে।

আমার বিশ্বাস বাঙালি মানসের বহু উচ্চারিত জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণার গর্ব ও অহংকারের অন্তরালে অন্য একটি শক্তিমান বৈশিষ্ট্য দীর্ঘকালীন বিদেশি শক্তির অধীনে সাংস্কৃতিক দাসত্বজনিত হীনমন্যতা পূর্বোক্ত স্ববিরোধিতার অন্যতম প্রধান কারণ। সেই সঙ্গে রয়েছে পূর্বঅভ্যাস থেকে নিজভাষায় ফেরার শ্রমসাধ্য যাত্রায় অনীহা।

শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ তো পূরণ হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে। তাই পূর্বধারায় যেমনটা চলছে চলুক না। তাতে ক্ষতি কী? এমনটাই ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণির মানসিকতা। বাংলা নিয়ে আন্দোলনের প্রয়োজন হয়েছিল তাদের আর্থ-সামাজিক স্বার্থ উদ্ধারের প্রয়োজনে। স্বাধীন বাংলাদেশে সে প্রয়োজন ভালোভাবে মিটেছে শিক্ষিত শ্রেণির জন্য। তাই বাংলা চুলোয় যাক, ক্ষতি নেই। শুধু তার বিজয়ের স্মৃতিরক্ষা করেই আনুষ্ঠানিকতায় ঋণশোধই যথেষ্ট। কিন্তু প্রকৃত জাতিরাষ্ট্র এ স্ববিরোধিতা স্বীকার করে না।

এর প্রমাণ ইউরোপের জাতিরাষ্ট্রগুলো। যেমন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন ইত্যাদি। তাদের মাতৃভাষা তাদের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষা। সেই ভাষাতে তাদের ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন ও জাতীয় জীবনের সর্ববিধ কাজকর্ম চলে। চলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও। এদিক থেকে কোনো ছাড় নেই, ব্যতিক্রম নেই। আধুনিক হয়ে, গণতন্ত্রী বা সমাজতন্ত্রী হয়েও তাদের ভাষিক জাত্যাভিমান প্রবল। কিন্তু আমাদের শ্রেণি-স্বার্থপরতা আমাদের ঠিক এর বিপরীত পথে চালনা করেছে। বৃথাই আমরা ভাষা নিয়ে, একুশে নিয়ে গর্ব করি। বাঙালির জন্য এ এক গভীর স্ববিরোধ, বিশাল তামাসা!

## যতীন সরকার

# মাতৃভাষা ও মানুষের মৌলিক পরিচয়

'মাতৃভাষা' কাকে বলে? এ-প্রশ্ন আমি আমার ছাত্রদের করে থাকি। উত্তরে সকল ছাত্রই নির্দ্বিধায় বলে দেয়, 'মায়ের ভাষাই মাতৃভাষা'। শুধু ছাত্র কেন, এরকম উত্তরের সত্যতা সম্পর্কে প্রায় কাউকেই সন্দেহ প্রকাশ করতে দেখিনি। যাঁরা ভাবুক প্রকৃতির মানুষ, তাঁরা তো বেশ কবিত্ব করে 'মাতৃভাষা'র উপমা খোঁজেন মাতৃদুগ্ধের মধ্যে। মায়ের বুকের দুধ খেয়ে যেমন শিশু বড় হয়, তেমনই মায়ের মুখের ভাষা শুনেই কথা কইতে শেখে,– সেই ভাষার নামই তো তাই 'মাতৃভাষা'। মায়ের থেকে মাতৃভাষাকে কিছুতেই আলাদা করা যায় না।

হ্যাঁ, মা এবং মাতৃভাষা–এ দুটো শব্দের অন্তর্নিহিত ঐক্যকে আমিও অস্বীকার করি না। এমনকি মা আর মাতৃভাষার মর্যাদা অভিন্ন বলেই আমি মনে করি। কিন্তু গর্ভধারিণী মায়ের মুখের ভাষাই যে মাতৃভাষা– এ কথা মেনে নিতে আমার ভীষণ আপত্তি।

এ-আপত্তির কারণটা একটু বিশদভাবে বয়ান করা দরকার।

প্রথমে উদাহরণ আহরণ করি একটি কাল্পনিক কাহিনি থেকে। কাহিনিটি রবীন্দ্রনাথ রচিত তার 'গোরা' উপন্যাসের। এক আইরিশ সৈনিক কোনো এক বিপর্যয়ে পড়ে সস্ত্রীক জনৈক বাঙালি ব্রাহ্মণের ঘরে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই এই সৈনিকের স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। সন্তান-প্রসবের প্রায় অব্যবহিত পরেই ওই মহিলা মারা যান, এবং মারা যান তার সৈনিক স্বামীও। এরপর তাদের ওই পুত্রটি সেই ব্রাহ্মণ পরিবারেই বড় হতে থাকে এবং যিনি তাকে অপত্য স্নেহে লালন করেছিলেন সেই ব্রাহ্মণ-মহিলা আনন্দময়ী তার নাম রাখেন 'গোরা'। গোরা তার



প্রকৃত মাতৃপিতৃ-পরিচয় জানতো না। সে বাঙালি হিন্দুর ঘরে হিন্দুর মতোই মানুষ হয়ে ওঠে, হিন্দুত্বের মর্যাদা রক্ষার জন্য সে তার সমস্ত মন-প্রাণ উৎসর্গ করে দেয়। কিন্তু উপন্যাসের কাহিনির শেষে যখন তার প্রকৃত পরিচয়টি তার কাছে উদঘাটিত হয়ে পড়ে, তখন তার চিন্তা-ভাবনা তথা সমস্ত জীবন-দর্শন ওলট-পালট হয়ে যায়। গোরার এই পরিণতির ব্যাপারটি কিংবা তার জীবন-ভাবনার বিষয়ও, বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের বিবেচ্য নয়। আমরা শুধু তার ভাষার ব্যাপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখতে চাই।

গোরার মায়ের ভাষা ছিল আইরিশ, কিন্তু গোরা আইরিশ ভাষার এক বর্ণও জানতে পারেনি, বাংলা ভাষাই হয়েছে তার ভাবনার ও ভাবনা-প্রকাশের মাধ্যম। অর্থাৎ তার নিজের ভাষা হলো বাংলা ভাষা। এখন, মায়ের ভাষাকেই যদি বলি মাতৃভাষা, তবে বলতে হয় যে, গোরার নিজের ভাষা বাংলা হলেও তার মাতৃভাষা আইরিশ। কথাটা কি একান্তই হাস্যকর শোনাবে না?

গোরার গর্ভধারিণী মাতার ভাষা বাংলা না হলেও তার মাতৃভাষা যে বাংলা-একথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। তাই যদি হয়, তবে তো 'মাতৃভাষা' শব্দটির অন্যতম অর্থ খুঁজে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।

গোরার মতো এ রকম দৃষ্টান্ত শুধু উপন্যাস থেকে নয়, আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও আহরণ করা সম্ভব। তবু, প্রায় সকল মনুষ্যশিশুই গর্ভধারিণী মায়ের মুখ থেকে শুনে ভাষা শিখে থাকে বলেই সম্ভবত 'মায়ের মুখের ভাষাই মাতৃভাষা'– এ রকম ধারণা সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে গেছে বলা যায়, এর সত্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন আমাদের মনে উদয় হয় না। কিন্তু যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করলে এ ধারণা আমাদের পাল্টাতে হবে, অনন্ত সংশোধন তো করেই নিতে হবে।

মায়ের গর্ভে অস্তিত্ব লাভ করার পর ভূমিষ্ঠ হয়ে পৃথিবীর আলো যেমন দেখে মানবশিশু, তেমনই দেখে মানবেতর অন্য অন্য পশুশিশুও। মানবসন্তান আর পশুসন্তানের মধ্যে এক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্যটা ঘটে এবং ঘটতে থাকে জন্মের পরে।

পশুর সন্তান জন্ম থেকেই পশু। যেমন– ছাগলের বাচ্চা, গোরুর বাচ্চা, হাতির বাচ্চা ছাগল গোরু হাতি হয়েই জন্মায়, সারাজীবন ছাগল গোরু, হাতিই থাকে, অন্য কিছু হয় না, হতে পারে না। সব পশুর বাচ্চাই এ-রকম। কেবল মানুষের বাচ্চাই অন্যরকম। মানুষ জন্ম থেকেই মানুষ নয়, জন্মের পর তাকে মানুষ হয়ে ওঠতে হয়। কথাটা নিশ্চয়ই আক্ষরিক অর্থে নয়, সত্য এর মর্মার্থের দিক দিয়ে। আক্ষরিক অর্থের বিচারে মানুষও মানুষ হয়ে জন্ম নেয়, মানুষের বাচ্চাই মানুষ হয়, মানুষ জন্মের পরে অন্য কোনো পশু হয়ে যায় না কিংবা অন্য কোনো পশুর বাচ্চা জন্মের পরে মানুষ হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু মর্মার্থের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে: বিশ্বাস-সংস্কার, মূল্যবোধ-যুক্তিবিচার, আচার-আচরণ, সৃজন-মনন ইত্যাদি যা কিছু মানুষের মনুষ্যত্বকে ধারণ করে, তার কোনোকিছু নিয়েই মানুষ জন্মায় না; এগুলোর সবকিছুই জন্মের পর মানুষকে অর্জন করে নিতে হয়। মনুষ্যত্ব অর্জন করার জন্য তাকে নতুন জন্ম নিতে হয়, এই নতুন জন্মের জন্য অন্যতর এক মায়ের গর্ভকে আশ্রয় করতে

হয়। সেই মা-ই হচ্ছে 'ভাষা'। এই ভাষা-মাই তাকে পশু থেকে স্বতন্ত্র, সে-সবের প্রথমটি হচ্ছে মানুষের চিন্তাশক্তি; মানুষ চিন্তা করতে পারে, পশু চিন্তা করতে পারে না। বাইরের উদ্দীপকে পশু কেবল সাড়া দেয়, সেই সাড়া দেয়ার শক্তিটি সে জন্ম থেকেই সঙ্গে করে নিয়ে আসে। কিন্তু বাইরের উদ্দীপকে সাড়া দেয়ার চেয়ে মানুষ আরো অন্য অতিরিক্ত কিছু করতে পারে। বাইরের বস্তুকে এবং বস্তু থেকে তার মস্তিষ্কে প্রতিফলিত উদ্দীপককে সে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে। এই বিচার-বিশ্লেষণ সে করে তার চিন্তা দিয়ে। একদিকে মানুষের এই চিন্তা, আর অন্যদিকে বাইরের উদ্দীপনায় পশুর নিছক সাড়া দান বা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ-গুণগতভাবেই এই দুয়ের বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ভিন্নতাই পশু ও মানুষের মধ্যে ভিন্নতা নিয়ে এসেছে।

চিন্তা করার শক্তিই মানুষকে পশু থেকে ভিন্ন বানায় বটে, কিন্তু এই চিন্তার আধার হচ্ছে মানুষের ভাষা। ভাষা ছাড়া চিন্তা করা অসম্ভব। ভাষার সাহায্যে আমরা আমাদের চিন্তাকে প্রকাশ করি– এ কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু প্রায়শই খেয়াল করে দেখি না: ভাষা শুধু আমাদের চিন্তার প্রকাশ-মাধ্যমই নয়, চিন্তাকে আমরা ধারণও করি ভাষা দিয়েই। আমাদের ভাষা না থাকলে আমরা চিন্তা করতাম কী দিয়ে? ধরা যাক, এই মুহূর্তেই আমি চিন্তা করছি,– 'লেখাটা শেষ করেই আমি খেতে বসবো।' চিন্তা করছি মানে এই কথাগুলো, কথার শব্দগুলো মুখে উচ্চারণ করে প্রকাশ করছি না ততক্ষণ তাকে 'ভাষা' বলছি না, বলছি 'চিন্তা'। আর উচ্চারণ করে ফেললেই তাকে বলছি 'ভাষা'। অর্থাৎ একটি ঘটনাই অনুচ্চারিত থাকলে বলছি 'চিন্তা', আর উচ্চারিত হয়ে গেলেই বলছি 'ভাষা'। তার মানে চিন্তা হচ্ছে অনুচ্চারিত ভাষা, আর ভাষা হচ্ছে উচ্চারিত চিন্তা। চিন্তা মানে মনে মনে কথা বলা, আর কথা বলা মানে জোরে জোরে চিন্তা করা।

চিন্তা ও ভাষার সম্পর্ক নিয়ে এখানে অত্যন্ত সরলভাবে যা বলে ফেললাম, এ দুয়ের সম্পর্ক এতটা সরল নয় নিশ্চয়ই। তবু চিন্তা ও ভাষার সম্পর্কটি যে একান্ত ঘনিষ্ঠ, সে-কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। তা না হলে মানুষের মাতৃভাষার তাৎপর্য ও জীবনে তার গুরুত্বের বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের ধারণা মোটেই স্পষ্ট হবে না। সেই সঙ্গে এ-কথাও বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন: চিন্তা আর ভাষা– এই দুয়ের কোনোটা নিয়েই মানুষ জন্মায় না। জন্মের মুহূর্তে পশুর সন্তানের মতো মানুষের সন্তানও থাকে চিন্তাহীন ও ভাষাহীন। পশুসন্তান আর মানবসন্তানে কোনো পার্থক্য তখনই থাকে না। তবে পার্থক্যটি থাকে সুপ্ত হয়ে। সেই পার্থক্যটি হচ্ছে: মানুষের সন্তানের ভেতর মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেই সম্ভাবনা নিয়েই সে জন্মগ্রহণ করে; পশুর সন্তানের ভেতর সে-রকম কোনো সম্ভাবনাই থাকে না, সারাজীবন তাকে পশু হয়েই থাকতে হয়। মানব শিশু সেই সম্ভাবনাটিকে সুপ্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত ও বিকশিত করে নিয়েই মানুষ হয়ে ওঠে। কিন্তু মানবশিশুর মানুষ হয়ে ওঠার সম্ভাবনাটি আপনা-আপনিই বিকশিত হয় না। সমাজের ভেতর থেকেই সেটি তাকে অর্জন করতে হয়, সেই ভাষাই তাকে মায়ের মতো গর্ভে ধারণ করে মানুষরূপে তার জন্ম দেয়। এ কারণেই সেই ভাষা হয়ে যায় তার মা, এর নাম তাই মাতৃভাষা। এই মাতৃভাষা তাই, মায়ের ভাষা নয়। এই ভাষা নিজেই মা,



'মাতৃভাষা' শব্দটির ব্যাসবাক্য হলো 'মাতৃস্বরূপিনী ভাষা'। মানুষ জীবনভর যে-ভাষা দিয়ে চিন্তা করে ও চিন্তাকে প্রকাশ করে, সেটি আর কোনো ভাষাই নয়, সেটি একান্তই তার মাতৃভাষা। এই ভাষামাতার গুরুত্ব গর্ভধারিণী মাতার চেয়ে কোনো অংশে কম তো নয়ই, একঅর্থে বেশিই বরং। গর্ভধারিণী মাতা আমাদের জন্ম দেন 'মানুষ হওয়ার সম্ভাবনাপূর্ণ একটি প্রাণি' রূপে, আর সে- রকম প্রাণি হয়ে জন্মানোর পর নতুন করে আবার আরেক মায়ের অর্থাৎ মাতৃভাষার গর্ভে পুষ্ট হয়েই আমরা পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠি। গর্ভধারিণী মায়ের কোল ছেড়েই আমরা বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করি, সে জীবন যাপন করার জন্য সেই মানবী মায়ের আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু আমাদের চিন্তা ও চিন্তার প্রকাশ যেহেতু মাতৃভাষা দিয়েই করতে হয় এবং সেরূপ না করে যেহেতু আমাদের মানুষী অস্তিত্বই রক্ষা করতে পারি না, সেহেতুই ভাষামাতা বা মাতৃভাষার কোলে সারাজীবন সারাক্ষণই আমাদের অবস্থান করতে হয়। মায়ের কোল থেকে ছিটকে পড়লে অস্তিত্বই অর্থহীন হয়ে পড়ে।

মাতৃভাষা ছাড়া অন্যভাষাও আমরা শিখে নিতে পারি বটে। অন্য ভাষাতেও আমদের চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারি অবশ্যই, তবে সে ভাষায় চিন্তা করতে পারি কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে যথেষ্ট। অন্য ভাষা শেখা মানে মাতৃভাষায়-ভাবিত-ভাবনাকেই অন্যভাষায় অনুবাদ করে নেয়ার পদ্ধতিটি আয়ত্ত করে ফেলা। গভীর অনুশীলন ও প্রতিনিয়ত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সেই আয়ত্ত করাটা এমন হয়ে যেতে পারে যে, তখন অন্য ভাষা ব্যবহারকে মাতৃভাষার অনুবাদ বলে মনেই হয় না। এ-রকম দক্ষ ব্যবহারকারীর নিজেরও মনে হতে পারে যে, তিনি যেন ওই অন্য ভাষাতেই চিন্তাও করছেন, মাতৃভাষার সঙ্গে সে-চিন্তার কোনো সম্পর্ক নেই। তখন ওই অপর ভাষাটিও তার মাতৃভাষার মতোনই হয়ে যায়। তবে, বলা উচিত: 'মাতৃভাষার মতোন'ই হয় কেবল, 'মাতৃভাষা' হতে পারে না। খুবই হালকা চালে যদি বলি, তবে ওই ভাষাটিকে বড় জোর 'শাশুড়ি-ভাষা' বলতে পারি। শাশুড়ি মায়ের মতো হলেও হতে পারে, কিন্তু সত্যিকারের মা হতে পারে না কখনো।

হতে যে পারে না, গোপাল ভাঁড়ের গল্প থেকে তার একটি কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টান্ত হাজির করা যায়।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় একজন পণ্ডিতের আগমন হলো। ওই পণ্ডিত একেক দিন একেক রকম পোশাক পরে সভায় এসে হাজির হন এবং প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলেন। যেদিন যে ভাষায় কথা বলেন, সেদিন সে ভাষাটাকেই তাঁর মাতৃভাষা বলে সবার কাছে মনে হয়– এমনই তার বিভিন্ন ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গোপাল ভাঁড়কে ডেকে বললেন, 'গোপাল, তুমি তো তোমার বুদ্ধির খুব গর্ব করে থাক। কিন্তু বলতে পারবে কি, ওই পণ্ডিতটি কোন জাতের, কী তাঁর মাতৃভাষা?'

গোপাল বললো, 'এ তো খুব সোজা। আজকেই আমি তার আসল পরিচয় সভার সকলকে জানিয়ে দেবো।'

সেদিন সন্ধ্যায় পণ্ডিত যখন রাজসভায় ঢুকতে যাচ্ছেন, তখনই গোপাল ভাঁড় অন্ধকারে পেছন থেকে অতর্কিত ওই পণ্ডিতকে মারলো এক প্রচণ্ড ধাক্কা। পণ্ডিত টাল

সামলাতে না পেরে ধপ করে মাটিতে পড়ে গেলেন আর তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'সড়া অন্ধা।' গোপাল সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'মহারাজ, ওই ব্যাটা উড়ে।' অর্থাৎ ওই পণ্ডিত ওড়িশাবাসী, তার মাতৃভাষা 'ওড়িয়া'। ওড়িয়া ভাষার 'সড়া অন্ধা' কথাটার অর্থ 'শালা অন্ধ'।

পণ্ডিত তো কত রকমের ভাষাই শিখেছিলেন, কিন্তু আকস্মিক বিপদে কোনো ভাষাই তার মুখ দিয়ে বের হলো না। ওই সব ভাষাকে তিনি মায়ের মতোই মনে করেছিলেন হয়তো; কিন্তু মা যে তারা কেউই নয়, আচমকা এক ধাক্কা খেয়ে পণ্ডিত নিশ্চয়ই তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন। সংকট মুহূর্তে একমাত্র প্রকৃত ভাষা-মা বা মাতৃভাষা ছাড়া কোনো 'শাশুড়ি ভাষা'ই তার মুখে কথা যুগিয়ে দিতে আসেনি। একমাত্র মাতৃভাষাই মানুষের সত্তায়, তার চিন্তা-চেতনায়, জড়িত মিশ্রিত হয়ে থাকে সারাজীবন ধরে। মাতৃভাষাই তাকে সারাজীবন প্রকৃত মায়ের মমতা দিয়ে আগলে রাখে, তার চিন্তাকে ধারণ করে, প্রকাশ করে। স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তা একমাত্র মাতৃভাষাতেই করা সম্ভব। চিন্তাশক্তির অধিকারী হয়েছে বলেই তো মানুষ জাতি সকল প্রাণির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে তার রাজ্যপাট বিস্তার করেছে। সেই চিন্তাশক্তি যেহেতু অভিব্যক্তি পায় মাতৃভাষার মাধ্যমেই, তাই বলা যায়, মাতৃভাষা ছাড়া মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ সম্ভব নয়।

মানুষের তো নানান পরিচয়। পেশার দিক দিয়ে মানুষ হতে পারে কৃষক, শ্রমিক, দোকানদার, ডাক্তার, মাস্টার ইত্যাদি, ধর্মসম্প্রদায়গত পরিচয়ে হতে পারে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, পারসি, বাহাই বা অন্য কিছু। মতাদর্শের বিচারে হতে পারে আস্তিক, নাস্তিক, ভাববাদী, বস্তুবাদী, অজ্ঞেয়তাবাদী এবং নৈতিকতায় সুনীতিনিষ্ঠ, দুর্নীতিবাজ, সাধু, চোর, ঘুষখোর ইত্যাদি হরেক রকমের; কিন্তু মানুষের এসব পরিচয়ের কোনোটাই অপরিবর্তনীয় নয়। মানুষ যে কোনো সময়ে তার পেশা পরিবর্তন করতে পারে, ধর্মান্তরিত হয়ে এক ধর্মসম্প্রদায় থেকে অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। মতাদর্শের পরিবর্তন তো মানুষ হরহামেশাই করে থাকে। একান্ত নীতিনিষ্ঠ মানুষেরও দুর্নীতিবাজ হয়ে যাওয়া কিংবা চোরের সাধু হয়ে যাওয়াও সম্ভব। কিন্তু কোনো মানুষের পক্ষেই তার মাতৃভাষাকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করে অন্য ভাষা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ পেশাগত, ধর্মগত ও মতাদর্শগত পরিচয়টি মানুষের মৌলিক পরিচয় নয়; কারণ এসব পরিচয় পরিবর্তনযোগ্য। মাতৃভাষা সূত্রে নির্দিষ্ট হয়ে-যাওয়া পরিচয়টিই হচ্ছে মানুষের মৌলিক পরিচয়, কারণ এটি তার সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে অপরিবর্তনীয়ভাবে যুক্ত হয়ে থাকে। এই পরিচয়টি মানুষ লাভ করে কোনো একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী থেকে, প্রতিটি ভাষাই কোনো-না-কোনো জনগোষ্ঠীর সম্পদ। সেই বিশেষ ভাষাবিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর পরিচয়ই মানুষের মৌলিক সামাজিক পরিচয়। মানুষকে যে বলা হয় সামাজিক জীব, সেই সামাজিক জীব হওয়ার ভিত্তিটা রচনা করে দেয় তার মাতৃভাষাই। এখানেই মাতৃভাষার আসল গুরুত্ব।

জনগণের অভিন্ন মাতৃভাষার সূত্রেই গড়ে ওঠে একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী। সেই বিশেষ জনগোষ্ঠীটি আস্তে আস্তে নানাভাবে বিভক্ত হয়ে যায়, এর ভেতর দেখা দেয়



নানারকম বিভেদ। ধর্মের ভেদ, বুদ্ধির ভেদ, অর্থসম্পদের ভেদ, শ্রেণির ভেদ, পেশার ভেদ– এ রকম আরো কতকিছুর। কিন্তু সকল বিভেদ সত্ত্বেও সেই জনগোষ্ঠীকে একটি অখণ্ড পরিচয়ে চিহ্নিত করে রাখে তার অভিন্ন মাতৃভাষা। কোনো বিভেদই তার ওই অভিন্ন পরিচয় চিহ্নটিকে মুছে দিতে পারে না।

আমাদের বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীকে ভালো করে দেখে নিলেই ব্যাপারটি একান্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠতে পারে। এই গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যেও বিভেদ কম ছিল না। সে সব বিভেদ নিয়ে মারামারি কাটাকাটিও কম হয়নি। ধর্মীয় পরিচয়কে বড় করে তুলে এখানকার হিন্দু-মুসলমানেরা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিরত হয়েছে। ধর্মের নামেই এদের কেউ কেউ মাতৃভাষাকেও অস্বীকার করেছিল। হিন্দুর ভাষা আর মুসলমানের ভাষাকে আলাদা করে ফেলতে চেয়েছিল। 'বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা নয়'– এ রকম হাস্যকর কথা উচ্চারণ করতেও এদের কেউ কেউ লজ্জিত হয়নি। বাঙালি জনগোষ্ঠীর ভাষাগত ঐক্যকে মূল্য না দিয়ে ধর্মের পরিচয়ে চিহ্নিত করে একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলার কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও তারা নিজেদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করে দিয়েছিল; কিন্তু সত্যি সত্যিই যখন ওই রাষ্ট্রটি বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং ওই তথাকথিত ধর্মরাষ্ট্রের কর্ণধাররা যখন বাঙালির মাতৃভাষার ওপর আঘাত হেনে বসলো, তখন সে আঘাতে সেই জনগোষ্ঠীর সমস্ত সত্তা আর্তচিৎকার করে ওঠলো। মাতৃভাষার পরিচয়ের কাছে ধর্মের পরিচয় যে একান্তই তুচ্ছ– এ সত্যটি বুঝে নিতে তাদের একমুহূর্তও বিলম্ব হলো না। তখন সেই কৃত্রিম রাষ্ট্রটির বাঁধন ছেড়ে তাদের বেরিয়ে আসতে হলো মাতৃভাষার অমোঘ প্রতিরোধ্য টানেই। মাতৃভাষার সংহতিকারী শক্তি যে কী প্রচণ্ড, সেদিন তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তান নামক একটি বর্বর রাষ্ট্রের অত্যাচারই বাংলাভাষী জনগণকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, হিন্দুর মাতৃভাষা বা মুসলমানের মাতৃভাষা বলে আলাদা কিছু হতে পারে না, কোনো ভাষারই ধর্মীয় চরিত্র নেই। ধর্মের পরিচয়ে কোনো জাতিও গঠিত হতে পারে না, একটি জনগোষ্ঠীর জাতিতে পরিণত হওয়ার অন্যতম প্রধান উপাদানই হচ্ছে তার অভিন্ন মাতৃভাষা। অনেক রক্তের বিনিময়ে বাঙালির একটি স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মাতৃভাষা সম্পর্কীয় এই অমোঘ প্রমাণিত হয়েছে।

কোনো ভাষারই যেমন কোনো ধর্মীয় চরিত্র নেই, যে কোনো ভাষার মানুষই যেমন যে কোনো ধর্মের অনুসারী হতে পারে, তেমনই ভাষার কোনো শ্রেণিচরিত্রও নেই, শ্রেণিভাষা বলে কোনো ভাষাও থাকতে পারে না, যেকোনো ভাষার মানুষই যেকোনো শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রেণিসংগ্রামই ইতিহাসের চালিকাশক্তি হলেও একই জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত পরস্পর বিরোধী শ্রেণিগুলোর মাতৃভাষা অভিন্ন। জার্মান ইংরেজ রুশ বা বাঙালি ধনিকদের মতো শ্রমিকদেরও মাতৃভাষা জার্মান, ইংরেজি, রুশ বা বাংলা। এই একটি বিষয়েই ধনিকে-শ্রমিকে তথা শ্রেণিতে শ্রেণিতে কোনো তফাৎ নেই, মাতৃভাষার পরিচয়টাই কেবল কোনো জনগোষ্ঠীকে শ্রেণির ঊর্ধ্বে স্থাপন করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন মাতৃভাষার মধ্যে মূলত কোনো বিরোধ নেই, এরা পরস্পর শান্তিতে সহাবস্থান করতে পারে, একটি আরেকটির দ্বারা প্রভাবিত হতে

পারে, পরস্পরের সম্পদে সমৃদ্ধও হয়ে ওঠতে পারে। বলা যায়– বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু সে পার্থক্য বিরোধমূলক নয়, সহযোগিতামূলক। পরস্পরের মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করার বদলে সম্মানিত করেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সৌহার্দ্য গড়ে ওঠতে পারে, মানুষের পৃথিবী শান্তি-সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠতে পারে।

বাস্তবে কিন্তু এই কাঙ্ক্ষিত অবস্থাটি সর্বত্র ও সর্বদা বিদ্যমান থাকে না। অনেক প্রতাপশালী গোষ্ঠী অনেক দুর্বল গোষ্ঠীর মাতৃভাষাকে অনেক সময়েই দাবিয়ে রাখতে চায়, এমনকি ধ্বংস করে দিতে চায়। তখনই সংঘাতমুখর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমরা বাঙালিরা, এরকম পরিস্থিতিরই শিকার হয়েছিলাম। মাতৃভাষার জন্য আমাদের আত্মদানই বিশ্বসমাজকে পৃথিবীর সকল জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছে, বাঙালির ভাষার জন্য আত্মত্যাগের দিনটিই 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে।

এর ফলে কিন্তু বিশ্বসমাজের দায়িত্বও অনেক বেড়ে গেছে। পৃথিবীর সকল জনগোষ্ঠীই যাতে নিজ নিজ মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে, মাতৃভাষার মাধ্যমেই একান্ত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষটিও যাতে আত্মবিকাশ লাভ করতে পারে, কোনো ভাষাই যাতে অন্য ভাষার বিকাশকে ব্যাহত করতে না পারে– সেসব বিষয় নিশ্চিত করাও এখন বিশ্বসমাজের দায়িত্বের অন্তর্গত।

আর যাদের সংগ্রাম ও আত্মদানের ফসল এই 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস', সেই বাঙালি জনগণের দায়িত্ব যে কত অসীম হয়ে দেখা দিয়েছে, সে বিষয়ে কোনো বাকবিস্তার না করলেও বোধ হয় চলে। তবে এটুকু অন্তত বলা যায় যে, মাতৃভাষার প্রকৃত তাৎপর্য ও গুরুত্বের উপলব্ধি আমাদের একান্ত প্রয়োজন। সে উপলব্ধিকে বিস্তৃত ও সার্থক করার জন্যই প্রয়োজন যেমন আমাদের নিজের ভাষার সমৃদ্ধি সাধন, তেমনই প্রয়োজন আমাদের আশেপাশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষদের মাতৃভাষাচর্চায় সহযোগিতার হাত প্রসার করে দেয়া ॥



রফিকুল ইসলাম

# বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

বাংলাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চল হলো বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং এ রাজ্যের সীমান্তবর্তী ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা (ওড়িশা), ত্রিপুরা; আসামের (অসম) বরাক উপত্যকা (শিলচর, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ), গোয়ালপাড়া, ও ধুবড়ি অঞ্চল। দক্ষিণ-এশিয়ার এই অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী বাস করতো না। আর্যদের আগমনের পূর্বে এই অঞ্চলে বিভিন্ন অন-আর্য জনগোষ্ঠীর বাস ছিল। তাদের ভাষা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন–

বাংলাদেশ আর্য ভাষার আগমনের পূর্বে কোল আর দ্রাবিড় আর উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ভোট-চীনা, এই তিনটি ভাষারই অস্তিত্বের প্রমাণ পাই। .... কোলেরা প্রায় সমস্ত দেশটি জুড়ে ছিল, দ্রাবিড়েরা ছিল বেশির ভাগ পশ্চিমবঙ্গে, আর মোঙ্গলেরা ছিল পূর্ব আর উত্তরবঙ্গে। (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭৪:৩৩,৪১)।

বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় তথা ইন্দো-ইরানীয় তথা ইন্দো-আর্য গোত্রের একটি ভাষা। এখানে সংক্ষেপে ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের পরিচয় দেওয়া হল।

### ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা

অনুমান করা হয় যে, ইন্দো-ইউরোপীয় মূলভাষার আদি পীঠস্থান মধ্য এশিয়ার কিরগিজ তৃণভূমি, কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর ও আরল সাগরের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড বা কৃষ্ণসাগর অথবা কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল। এই কিরগিজ স্থানের উষর অঞ্চলই যে আদি ইন্দো-ইউরোপীয়দের বাসভূমি– এ অভিমত অধিক সমর্থিত। ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। সংস্কৃত, গ্রিক ও লাতিনের তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার আনুমানিক রূপ পুনর্গঠন করা হয়েছে। উইলিয়াম জোনস ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে, লাতিন, গ্রিক, সংস্কৃত, জার্মানিক ও কেলটিক ভাষাসমূহের মধ্যে সম্পর্কের কথা প্রথম উল্লেখ এবং ওই ভাষাগুলির একটি সাধারণ উৎসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অনুমিত হয়। তিনি ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এ তাঁর তৃতীয় বার্ষিক ভাষণে বলেন:

The Sanscrit Language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquistely refined, than either; yet bearing to both of them a strong affinity, both in the roofs of verbs, and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; so strong, indeed that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprung from some common source, which perhaps, no longer exists. There is a similar reason, though not quite to frocible, for supposing that both the Gothik and the Celtik, though blended with a very different idiom, had the same origin with the Sancrit; and the old persian might be added to the same family, it this were the place for discussing any question concerning the antiquities of Persia (Jones, 1824:28)

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ফ্রানটস্ বপ, রাসমুস রাস্ক, ইয়াকব গ্রিম, আউগুস্ট পট প্রমুখ বিশেষজ্ঞের গবেষণার ফলে উইলিয়াম জোনসের মতে যথার্থ্য স্বীকৃতি পায়। গ্রিমের আলোচনায় যার সূত্রপাত, ব্রুগমান ও ডেলব্রুকের Outline of the Comparative Grammar of the Indo-European Langage (1886-1900) গ্রন্থে তার বিকাশ। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রাথমিক বিভাজন 'কেন্তুম' ও 'শতম' বিভাগ, মূল ভাষার তালব্য/ক্/ধ্বনির উচ্চারণ-পার্থক্য (ক্-শ্) থেকেই এই বিভাগের সৃষ্টি। মূল ভাষার কয়েকটি শাখায় যেমন ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য, বালতো-স্লাভিক, আর্মেনীয় এবং আলবেনীয়তে মূল ভাষা থেকে আগত যেসব শব্দে /ক্/ ধ্বনি ছিঠ সেসব শব্দে ওই ধ্বনি /শ/ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু গ্রিক, লাতিন, কেলটিক, জার্মানিক, তুখারীয় এব হিট্টিতে মূল ভাষার তালব্য /ক্/ ধ্বনি অবিকৃত থাকে। যেসব ভাষার মূল ভাষার /ক্/ ধ্বনি রক্ষিত সেসব ভাষাকে



'কেন্তুম' আর যেসব ভাষায় তা /শ্/ ধ্বনিতে পরিবর্তিত সেসব ভাষাকে 'শত্ম' বলা হয়। দুটি কথার অর্থই হলো 'একশো'।

আনুমানিক ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার একটি শাখা আদিম বাসস্থান থেকে দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া, কাজাকিস্তান, ককেসাসের দিকে এবং ককেসাস পর্বতমালা অতিক্রম করে উত্তর মেসোপটেমিয়ায় যায়। এখানে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার এই শাখাটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসহ কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত করে। এই নতুন বাসভূমিতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার এই শাখা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ২৫০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার এই শাখা মেসোপটেমিয়ায় বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে এবং স্থানীয় আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সেমেটিক সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। উত্তর মেসোপটেমিয়ায় আগত বসবাসকারী ইন্দো-ইউরোপিয়রা সংখ্যায় কম হলেও সংঘবদ্ধ থাকার ফলে তারা নতুন সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়নি। মিশ্র আসিরীয়-ব্যাবিলনীয় ভাষার লিখিত 'মিতান্নি' শিলালিপিতে কিছু ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ ও নাম পাওয়া গেছে যা বৈদিক, আবেস্তীয় এবং ইরানীয় থেকেও পুরোনো এবং প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার নিদর্শন।

## ইন্দো-ইরানীয় ও ইন্দো-আর্য

ইন্দো-ইউরোপীয় আগমনকারীদের একটি অংশ মেসোপটেমিয়ায় সেমেটিক ভাষাভাষী আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের মধ্যে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মিশে যায়, কিন্তু ইন্দো-ইউরোপীয়দের কয়েকটি উপজাতি মেসোপটেমিয়া থেকে মূল ভাষাসহ ইরান এবং ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করে; এই আগন্তুকেরাই আর্য নামে পরিচিত। তখন পশ্চিম ইরান থেকে উত্তর ভারতে সম্ভবত অন-আর্য দ্রাবিড় শ্রেণির মানুষেরা বসবাস করতো। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে তাদের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। বহিরাগত আর্যরা ইরান, আফগানিস্তান ও পাঞ্জাবের স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে যে মিশে যায়নি তা থেকে মনে হয়, ইরান ও ভারতে আগমনকারী আর্যরা সংখ্যায় খুব কম ছিল না। তবে ইরান ও ভারতবর্ষে আগমনকারী আর্যদের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর এসব অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব যথেষ্ট পড়েছিল। সুতরাং ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্যরা আসিরীয় ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ইরান ও ভারতের আর্যপূর্ব প্রাচীন পারস্য ও দ্রাবিড় সভ্যতা দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল। ইরানি ও ভারতীয় আর্যদের ভাষা ধর্ম ও রীতিনীতির মধ্যে অবশ্য সাধারণ ইন্দো-ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট পরিমাণে বজায় ছিল। যখন ইরানীয় আর্যরা আবেস্তীয় ও ভারতীয় আর্যরা বৈদিক সংস্কৃতি গড়ে তুলছিল, তখনকার অর্থাৎ ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইরানীয় ও আর্য উপভাষা প্রায় অভিন্ন ছিল, তারপর এই ভাষা ক্রমশ দুটি ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রূপে গড়ে ওঠে, যার একটি ইন্দো-ইরানীয় এবং অপরটি ইন্দো-আর্য।

## অন্-আর্য ও আর্য ভাষা

ঋগবেদে ভারতের আদিম অধিবাসীরা অর্থাৎ অন্-আর্যরা উল্লিখিত হয়েছে দাস, দস্যু বা অসুর নামে। এই 'দাস' উপজাতিদের বাস গাঙ্গেয় উপত্যকায়। ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্বদিকে আর্যদের অভিযানে এই অন-আর্যরা ছিল প্রতিপক্ষ। সম্ভবত গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই অন-আর্য দাসরাই বাঙালির পূর্বপুরুষ। ঋগবেদে পিশাচ ও রাক্ষসদেরও উল্লেখ আছে। এই অন-আর্যদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা অবৈদিকভাষী, বৈদিক কর্মবিরোধী, বেদের দেবতাবিরোধী এবং স্বভাবতই আর্যধর্মে নিষ্ঠাহীন। তাদের চাপা নাক, তারা কৃষ্ণবর্ণ এবং ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির অধীন। ঋগ্বেদের যুগেও ভারতবর্ষ তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল– ব্রহ্মাবর্ত বা আর্যাবর্ত, মধ্যদেশ এবং দক্ষিণাপথ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং অথর্ব বেদে পাঁচটি বিভাগ দেখা যায়– ধ্রুবা মধ্যমা প্রতিষ্ঠা দিশ বা মধ্য দিশ, প্রাচ্য দিশ, দক্ষিণা দিশ, প্রতীচী দিশ ও উদীচী দিশ। আর্য সংস্কৃতির প্রভাবের বাইরে প্রাচ্যের প্রত্যন্ত দেশ ছিল মগধ (দক্ষিণ বিহার) ও অঙ্গ। অথর্ব বেদে এই দুই দূরদেশের উল্লেখ আছে; গোপথ ব্রাহ্মণেও অঙ্গ ও মগধের উল্লেখ দেখা যায়। ঋগবেদে এবং অথর্ব বেদে মগধের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বিরূপ। এই বিরূপ মনোভাবের কারণে পূর্বাঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিরোধী মনোভাব এবং অন-আর্য সংস্কৃতির অস্তিত্ব সর্বোপরি পরবর্তীকালে জাতিভেদ বিরোধী বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব। বৈদিক সংহিতায় মগধদের বলা হয়েছে ব্রাত্য এবং পতিত, তারা যাযাবর এবং অসংস্কৃত প্রাকৃত ভাষাভাষী। তাণ্ড্যক পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে পূর্বদেশীয় ব্রাত্যদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, ব্রাত্যরা কষ্টকর নয়; এমন বাক্যও কষ্টে উচ্চারণ করে; তারা বৈদিক ধর্মে দীক্ষিত নয় তবে দীক্ষিতের ভাষা বলে অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলের অন-আর্যরা বৈদিক ধর্মে দীক্ষিত না হয়েও আর্যভাষী। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ, বগধ বা মগধ এবং চেরদের বলা হয়েছে পাখি অর্থাৎ অন-আর্য, যরা আর্যভাষী ছিলো না। এ থেকে বুঝা যায়, মাগধরাই যখন কষ্টসাধ্য নয় এমন বাক্য কষ্টে উচচারণ করে, তখন বঙ্গ অন-আর্যরা যে আর্যভাষা গ্রহণ করলে, পাখিদের পক্ষে তা আয়ত্ত করা কত কষ্টসাধ্য ছিল। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে বৈদিক আর্য সভ্যতার প্রসার বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তের নিকটে অবস্থিত মগধের কাছাকাছি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মগধে তখন বেদাচারহীন ব্রাত্যদের আধিপত্য ছিল। এই ব্রাত্যদের মধ্য থেকেই জৈন ও বৌদ্ধ মতবাদের উদ্ভব ঘটে। সম্ভবত এই ব্রাত্যদের মুখেই প্রাচীন ভারতীয় আর্যয় ভাষার 'প্রাকৃত' রূপান্তর ঘটে বা আর্যভাষার মধ্যমস্তর শুরু হয়। এই প্রাকৃতভাষী মাগধি ব্রাত্যরাই বাংলাদেশে আর্য-সংস্কৃতির প্রচারক। সম্ভবত জৈন সম্প্রদায়ই বাংলাদেশে প্রথম আর্য সভ্যতার বিস্তার ঘটায়। জৈন ধর্মগুরু মহাবীর রাঢ়ে আগমন করেছিলেন। জৈন তীর্থঙ্করদের অনেকে বঙ্গে আগমন করেন। জৈন মতবাদের প্রচারকেরা যখন বাংলাদেশে আর্য-প্রাকৃত ভাষার প্রচলন করেন সম্ভবত তখন এ দেশে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় শ্রেণির অন-আর্য জাতির বসবাস ছিল। তারা সহজে আর্য ধর্ম বা সংস্কৃতি গহণ করেনি। জৈন ধর্মগুরু মহাবীর রাঢ়ে আগমন করলে স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁর প্রতি কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। এই জৈন তীর্থঙ্কর ও শ্রাবকদের প্রচেষ্টাতেই বাংলাদেশে জৈন প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে। পৌণ্ড্রবর্ধনে ছিল জৈনদের একটি প্রধান কেন্দ্র। অন-আর্য ও বেদবিরোধী জৈন প্রভাবের ফলেই



খ্রিস্টীয় অব্দের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে বৈদিক সংস্কৃতি প্রবেশ করতে পারেনি। আর সে কারণেই সেকালে বাংলাদেশে আগমন করলে আর্যদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। বাংলাদেশ মগধ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় মৌর্যদের শাসনামলে। তখন মগধ থেকে রাজপুরুষ, সৈন্যসামন্ত, ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে আসতে থাকে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আর্য সংস্কৃতিরও প্রসার ঘটে বাংলাদেশে। সম্রাট অশোকের শাসনাকালে বাংলাদেশে মৌর্য প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। অশোকের সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রধান হওয়ায় বাংলাদেশেও সেই বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। আর এ সময়ে থেকেই বাংলাদেশে আর্য সভ্যতার প্রভাব বাড়তে থাকে। বস্তুত বাংলাদেশের আর্যকরণ যথাযথভাবে সংগঠিত হয় দক্ষিণ বিহারের মগধে গুপ্ত সম্রাটের শাসনামলে। বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক গুপ্ত আমলেই প্রথম বৈদিক ধর্ম প্রচারিত হয়। তারা মধ্যদেশ থেকে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বাংলাদেশে বসবাসের জন্য এবং বৈদিক ধর্ম প্রচারের জন্য ভূমিদান করতেন। চিনা পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলাদেম আর্যভাষী হয়ে উঠেছিল। আর্যভাষা বাংলাদেশ, আসাম ও নেপালের সীমান্ত পেরিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আর বিস্তৃত হতে পারেনি।

**প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্য**

সাধু বা শিষ্ট সংস্কৃত ভাষার বিশিষ্ট রূপটি গড়ে উঠেছিল পাণিনি এবং তাঁর পরবর্তী যুগে; কিন্তু এই সাধু বা কৃত্রিম সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় কথ্য ভাষাগুলোর জননী নয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার অসংস্কৃত কথ্য উপাদান ও উপভাষাগুলোই মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রকৃত জননী। সাধারণ সংস্কৃত ভাষায় প্রাকৃতের বিপুল প্রভাব রয়েছে, তাছাড়া প্রাকৃতে এমন অনেক উপাদান আছে, যা বৈদিক ও সংস্কৃতি ভাষা থেকে নয় বরং অধিকতর প্রাচীন উৎস থেকে বিবর্তিত।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা বা প্রাকৃতের উদ্ভব কেবল ভাষা-বিবর্তনের ফল নয়, সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগের ভারতে বিভিন্ন আদর্শের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলও বটে। ব্রহ্মাবর্ত ও আর্যাবর্তের বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বী পূর্বাঞ্চলের জীবন ও মূল্যবোধের পার্থক্য ছিল স্পষ্ট। স্বয়ং বুদ্ধদেব সংস্কৃতের পরিবর্তে প্রত্যেককে নিজ নিজ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একমাত্র বাহন আর জৈন বা বৌদ্ধরা জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের জন্য মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা বা প্রাকৃতের ব্যবহার করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধ হীনযান মতাবলম্বীরা গ্রহণ করলেন পালি, উত্তর ভারতের বৌদ্ধ মহাযানীরা সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্রিত এক সংকর বা গাথা ভাষা। শ্বেতাম্বরপন্থী জৈনরা গাথা-সাহিত্য রচনার জন্য নিলেন অর্ধমাগধি, আর গাথা নয় এমন সাহিত্যের জন্য নিলেন জৈন মহারাষ্ট্রি। দিগম্বরপন্থী জৈনদের গাথা-সাহিত্য রচিত হলো জৈন শৌরসেনিতে। ব্যাপক অর্থে সমগ্র মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার নাম হলো প্রাকৃত, যার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। আর এর অন্তর্ভূক্ত হলো অশোকানুশাসন, পালি, নিয়া প্রাকৃত, সাহিত্যিক প্রাকৃত, এমনকি অপভ্রংশ।

**প্রাকৃত ও অপভ্রংশ**

গ্রিয়ার্সন, পিশেল, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশেষজ্ঞ অপভ্রংশকে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার শেষ স্তর হিসাবে চিহ্নিত করলেও অপভ্রংশের ইতিহাস; কিন্তু আরও অনেক প্রাচীন। আবার অপভ্রংশ যে একদিক থেকে অর্বাচীন স্তরের তাতেও সন্দেহ নেই, কারণ, মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার সঙ্গে বা সাহিত্যিক প্রাচীন স্তরভুক্ত অশোক-প্রাকৃত এবং গান্ধারি-প্রাকৃতের সঙ্গেও অপভ্রংশের সম্পর্ক সাহিত্যিক প্রাকৃতের সঙ্গে যোগাযোগের চেয়ে কম নয়। এই কারণে প্রাচীন বৈয়াকরণরা অনেকে অপভ্রংশকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার পাশে স্বাধীন কাব্যিক রীতিসম্মত শিষ্ট সাধু ভাষার মর্যাদা দিয়েছেন। দশম শতকের সমসাময়িক অনেকে আবার অপভ্রংশকে বলেছেন দেশি ভাষা বা দেশীয় প্রাকৃত। বৈয়াকরণরাও অপভ্রংশ ও প্রাকৃতকে অনেক স্থানে একাকার করে ফেলেছেন। সুতরাং অপভ্রংশ ও দেশি ভাষার সম্পর্ক নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে।

পিশেল, গ্রিয়ার্সন, ব্লক, ভাণ্ডারকর, উলনার প্রমুখ পণ্ডিতের মতে, একান্তভাবে সংস্কৃত প্রভাব-বর্জিত শৌরসেনি অপভ্রংশই হলো মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার শেষ স্তরের যথার্থ লোক বা জনপদ ভাষা, যার পূর্ব স্তর হলো সাহিত্যিক প্রাকৃত। গ্রিয়ার্সন প্রত্যেক প্রাদেশিক প্রাকৃত এবং তা থেকে উদ্ভূত আধুনিক কথ্য ভাষার মধ্যবর্তী স্তরের আঞ্চলিক রূপভেদ নির্দেশ করেছেন। যেমন–

শৌরসেনি প্রাকৃত→শৌরসেনি বা নাগর→অপভ্রংশ

পশ্চিমা হিন্দি, রাজস্থানি, গুজরাটি।

মহারাষ্ট্রি প্রাকৃত→মহারাষ্ট্রি অপভ্রংশ→মারাঠি।

মাগধি প্রাকৃত→মাগধি অপভ্রংশ→বাংলা, বিহারি, ওড়িয়া।

অর্ধমাগধি প্রাকৃত→অর্ধমাগধি অপভ্রংশ→পূর্ব হিন্দি ইত্যাদি।

উক্ত পণ্ডিতদের মতে, শৌরসেনি অপভ্রংশ যথার্থ দেশি বাষা, যে ভাষা সাহিত্য-পদবাচ্য হলেও লোকাশ্রয়ী কিন্তু গ্রাম্যদোষমুক্ত। কিন্তু এই মত সর্বজনগ্রাহ্য নয়। য়্যাকবি, আলসডর্ফ, কিথ প্রমুখ পণ্ডিত মনে করেন যে, অপভ্রংশ হলো মূলত প্রাকৃত, তাই তার ব্যবহার কাব্য ও ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। গুজরাটি প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে অপভ্রংশের মিলের কারণ ভাষাগত প্রাদেশিক ভিত্তি, অন্যান্য আধুনিক কথ্য ভাষার সঙ্গে অপভ্রংশের সরাসরি যোগ নেই। এমনকি বাংলাদেশের প্রাকৃতপৈঙ্গলের মধ্যেও মাগধি লক্ষণের চেয়ে পশ্চিমা প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত। ধ্বনিগত গঠন ও শব্দভাণ্ডারে অপভ্রংশ প্রাকৃতাশ্রয়ী আর রচনারীতি ও রূপতত্ত্বে তা দেশি ভাষার কাছাকাছি আর এই দেশি ভাষা যেমন অপভ্রংশের ও কথ্য-ভাষার মূল উৎস, আধুনিক ভাষাগুলিরও তাই। এই পণ্ডিতদের মতে, অপভ্রংশ হলো সাধারণ প্রাকৃতের দ্বিতীয় স্তরভুক্ত; শৌরসেনি অপভ্রংশের মতো কোনো কল্পিত অপভ্রংশের লেখ্য প্রমাণ মেলে না। আধুনিক ভাষাগুলোর সঙ্গেও কল্পিত আঞ্চলিক প্রাকৃত বা অপভ্রংশের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না; তাছাড়া অপভ্রংশের ইতিহাস প্রাচীন, মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার শেষ স্তর থেকে তা উদ্ভূত হয়।



তাহলে প্রশ্ন ওঠে, অপভ্রংশ ও দেশি ভাষা কি এক? অ-প্রাকৃত অন্য আর এক স্তরের ভাষাই কি দেশি ভাষা? য়্যাকবির মতে, দেশি ভাষা হলো এক জাতীয় মিশ্রভাষা, যার উৎস কিছু সংস্কৃত বা লৌকিক সংস্কৃত, কিছু অস্ট্রিক বা মুণ্ডা বা দ্রাবিড় উপাদান। তিনি আও মনে করেন যে, দেশি ভাষা হলো সর্বভারতীয় জনপদ-ভাষা অর্থাৎ মানুষের মুখের ভাষা। এ কারণেই আধুনিক আর্যভাষাসমূহের বহু শব্দের সঙ্গে দেশি শব্দের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আর এই জনপদ ভাষা থেকে উপাদান সংগ্রহের ক্ষমতা প্রাকৃতের চেয়ে অপভ্রংশ আঞ্চলিক ভাষাগুলির সাহিত্যিক আদর্শ রূপে ব্যবহার হতো; কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতের মতো অপভ্রংশ হয়ে গেলো সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মতো সাহিত্যিক কৃত্রিম ভাষা। এই শতকেই বাণভট্ট ও হেমচন্দ লক্ষ্য করেছিলেন যে, গ্রাম্য ভাষা অপভ্রংশ থেকে পৃথক।

পরিশেষে, মনে রাখা দরকার যে, অপভ্রংশ সাহিত্য পদবাদ্য সাধুভাষাই, অপভ্রংশে লৌকিক উপাদান যথেষ্ট থাকলেও এ ভাষা কেবল কাব্যেই ব্যবহৃত। অপভ্রংশ কখনও সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল না, দেশি ভাষাই ছিল সর্বধারণের কথ্য বা মুখের ভাষা। দেশি ভাষার উপাদান অপভ্রংশে কিছু পাওয়া গেলেও অপভ্রংশে অব্যবহৃত এমন বহু শব্দ এখনকার ভাষায় পাওয়া যায়। সুতরাং এমন সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয় যে অপভ্রংশ বা অপভ্রষ্ট ভাষা থেকে আধুনিক ভাষাগুলির উৎপত্তি হয়নি, প্রাদেশিক ভাষাগুলো এসেছে কথ্য দেশি ভাষা থেকে। সর্বোপরি বাংলা, কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র অঞ্চলে আগের কোনো অপভ্রংশ ছিল কি না সন্দেহ; আর থাকলেও তার সঙ্গে বর্তমান ভাষার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। আধুনিক ভাষাগুলির উদ্ভব যেহেতু দশম-একাদশ শতকেই প্রায় সম্পূর্ণ, সে-কারণে বাংলা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলোর পূর্বরূপ অপভ্রংশ– এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না, বরং বলা যায় যে, দেশি ভাষাই হলো বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার পূর্বরূপ; যার বৈশিষ্ট্য বা উপাদান এখনও বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষায় রক্ষিত।

ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে বাংলা ভাষার কালানুক্রমিক বিবর্তন

ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে বাংলা ভাষার বিবর্তনের কালক্রম নিম্নরূপ:

১. ইন্দো-ইউরোপীয়, আনুমানিক ৩৫০০ খ্রিস্টপূর্ব

২. ইন্দো-ইরানীয়, আনুমানিক ১৮০০ খ্রিস্টপূর্ব

৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্য, আনুমানিক ১৫০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্ব (বৈদিক, সংস্কৃত প্রভৃতি)

৪. মধ্য ভারতীয় আর্য, আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ

ক. আদি-মধ্য ভারতীয় আর্য ৬০০-২০০ খ্রিস্টপূর্ব (অশোক-প্রাকৃত ও পালি)

খ. মধ্য-মধ্য ভারতীয় ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দ (আদি শিলালিপিসমূহের প্রাকৃত নাটকীয় প্রাকৃত, শৌরসেনি, মহারাষ্ট্রি, মাগধি, জৈন, অর্ধমাগধি)

গ. অন্ত্য-মধ্য ভারতীয় আর্য ৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ (অপভ্রংশ-পশ্চিমা এবং শৌরসেনি অপভ্রংশ)

৫. নব্য ভারতীয় আর্য ১০০০ খ্রিস্টাব্দ (কাশ্মীরি, জিপসি, সিন্ধি, লাহন্দি, পাঞ্জাবি, মালদ্বীপি, সিংহলি গুজরাটি, হিন্দি-উর্দু, আরধি, ভোজপুরি, মৈথিলি, ওড়িয়া, বাংলা, অসমিয়া, মারাঠি।)

বাংলা ভাষার কালক্রম

প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে বাংলা ভাষার কালক্রম ও নিদর্শন নিম্নরূপ:

প্রাচীন বাংলা: ১০ম থেকে ১৩৫০ শতক

নিদর্শন:

চর্যাপদ বা বৌদ্ধগান ও দোহা

মধ্যযুগ: ১৩৫০ থেকে ১৮ শতক

আদি-মধ্যযুগের বাংলা: ১৩৫০ থেকে ১৫ শতক নিদর্শন:

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন– বড়ু চণ্ডীদাস, ১৪ শতক

শ্রীকৃষ্ণবিজয়– মালাধর বসু, ১৫ শতক

রামায়ণ-কৃত্তিদাস, ১৫ শতক

মনসাবিজয়– বিপ্রদাশ পিপিলাই, ১৫ শতক

চণ্ডীমঙ্গল- মানিক দত্ত, ১৫ শতক

ইউসুফ জোলেখা- শাহ মুহম্মদ সগীর, আনুমানিক ১৫ শতক

পদ্মাপুরাণ (মনসামঙ্গল)– বিজয়গুপ্ত, ১৫ শতক

অন্ত-মধ্যযুগের বাংলা: ১৬ শতক থেকে ১৮ শতক

নিদর্শন:

চণ্ডীমঙ্গল– মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ১৬শতক

লাইলী মজনু- দৌলত উজির বাহরাম খান, ১৬ শতক

পদ্মাবতী– আলাওল, ১৭ শতক

সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী– দৌলত কাজী, ১৭ শতক

মহাভারত– কাশীরাম দাস, ১৭ শতক

অন্নদামঙ্গল– ভারতচন্দ্র, ১৮ শতক

আধুনিক যুগের বাংলা: ১৯ শতক থেকে বর্তমান।

বিশ্বের সব ভাষাতেই আঞ্চলিক বা উপভাষা এ বৈচিত্র্য রয়েছে। আরও আছে সামাজিক উপভাষা ও প্রমিত ভাষা। বাংলাভাষীদেরও আছে বিভিন্ন উপভাষা ও প্রমিত ভাষা। প্রত্যেক ভাষায়ই উপভাষা-বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন উপভাষীদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম রূপে প্রমিত ভাষা বা লিঙ্গুলিয়া ফ্রাঙ্কা থাকে। বাংলা ভাষা এর ব্যতিক্রম নয়।

বাংলা ভাষায় শুরু থেকে সাহিত্য রচিত হচ্ছিল সর্ববঙ্গীয় এক কাব্যভাষায়। তবে লোকসাহিত্য যেহেতু মুখে মুখে সৃষ্টি, সেজন্য তা বহুলাংশে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। আধুনিক যুগের বাংলা প্রথমে সাধু ভাষায় রচিত হতো। পরে চলিত ভাষার প্রয়োগ প্রাধান্য পায়। এই চলিত বাংলার সাদৃশ্য রয়েছে প্রমিত বাংলার সঙ্গে। কিন্তু এই প্রমিত বাংলা সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চলে বোধগম্য; যদিও ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে



এই প্রমিত বাংলার পার্থক্য রয়েছে উচ্চারণগত, বিশেষ করে বাক্যসুরগত (International)। বাংলা ভাষার যে কোনো উপভাষা অন্যান্য অঞ্চলে বোধগম্য নাও হতে পারে। সেখানেই প্রমিত বাংলার উপযোগিতা।

মনসুর মুসা

# বাংলা বানানের সমতা ও প্রামাণিকতার প্রশ্ন

**১.০ অসাম্যের উপলব্ধি**

বাংলাভাষার বানানে যে 'অসাম্য' আছে, তা চলন্তিকা অভিধানের সম্পাদক রাজশেখর বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার উদ্যোগের ফলে প্রকাশিত বানানের নিয়ম প্রকাশের প্রায় ১৬ বছর পরে লিখিত 'বাংলা ভাষার গতি' (১৯৫৩) প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'আসল কথা, নিয়ম যিনিই করুন, সকলের তা পছন্দ হবে না, লেখকেরা নিজের মতেই চলবেন। বাঙালির নিয়ম-নিষ্ঠার অভাব আছে। রাজনীতিক নেতা বা ধর্মগুরুর আজ্ঞা বাঙালি ভাবের আবেগে সংঘবদ্ধ হয়ে অন্ধভাবে পালন করতে পারে, কিন্তু কোনও যুক্তিসিদ্ধ বিধান সে মেনে নিতে চায় না... নিয়মবন্ধনে ফল হবে না।'

এই অসাম্যের নজির পাওয়া যাবে বাংলা ভাষার পণ্ডিতদের লেখায় প্রতিফলিত ভিন্ন বানানে:

১. সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা' লিখেছেন, ২. নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন 'বাংলা' (কিন্তু বাঙালী), ৩. ব্যোমকেশ মুস্তফী 'বাংলা', ৪. মনীন্দ্রকুমার ঘোষ 'বাংলা', ৫. অতীন্দ্র মজুমদার 'বাংলা', ৬. আব্দুল হাই 'বাংলা', ৭. নৃপেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 'বাংলা' ও 'বাঙলা', ৮. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'বাঙ্গালা ভাষা', ৯. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বাঙলা/বাঙ্গালা', ১০. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন বাংলা, ১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন 'বাংলা', ১২. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য 'বাঙ্গালা', ১৩. সুভাষ ভট্টাচার্য 'বাঙলা ভাষা', ১৪. পবিত্র সরকার 'বাংলা', ১৫. প্রবাল দাশগুপ্ত 'বাঙলা', ১৬. পুণ্যশ্লোক রায় 'বাংলা'।



দ্বিবিধ বানান যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের কোনটা লেখকের নিজস্ব বানান, আর কোনটা সম্পাদক কিংবা প্রুফ-সংশোধকের বানান, তা নিরূপণ করা দীর্ঘমেয়াদী কাজ। সেজন্য আলোচনাটি প্রাপ্ত উপাত্তেই সীমিত থাকবে।

১.১ সাম্য বা সমতার কামনা

রাজশেখর বসুর উপরিউক্ত শক্ত মন্তব্যের পরেও সাম্য বা সমতার কামনা থেমে যায়নি। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের তিনটি সংস্থা বানানে সমতা আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (১৯৯৫) সমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, বাংলাদেশের ঢাকার বাংলা একাডেমি করেছেন এবং বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড করেছেন। *আনন্দবাজার পত্রিকা* তো ইচ্ছামতো বানান পরিবর্তন করেছে। পত্রিকাটির মর্যাদা ও ক্ষমতার কারণে এক ধরনের সংস্কারমুখী বানান দু'বাংলায় ব্যাপকসংখ্যক বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবিত করেছে।

এসব সমতার উদ্যোগ বাংলাভাষার প্রতি তাদের প্রীতির পরিচয় বহন করে। শুধু তাই নয়, তাঁদের উদ্যোগের পেছনে বাঙালি শিশুর প্রতি তাঁদের অগাধ করুণার কথাও প্রকাশিত হয়েছে। শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলো যেন সহজ হয়, তার জন্য যুক্তাক্ষর ভেঙে দেওয়া কিংবা অস্পষ্ট যুক্তব্যঞ্জন স্পষ্টীকরণ করা কিংবা বহুলতা আছে, এমন বর্ণের বিলোপ ঘটানো ইত্যাদি যুক্তি তাঁরা বিভিন্ন সময় উত্থাপন করেছেন। যুক্তিগুলোর একটি কালক্রমিক ইতিহাস রচিত হতে পারে। তবে এইসব যুক্তি কতটা ভাষাতাত্ত্বিক, কতটা ধ্বনিতাত্ত্বিক আর কতটা লিপিতাত্ত্বিক তা নিরূপিত হওয়া প্রয়োজন।

**২.০ মান্যতার মানদণ্ড কি?**

যে সমস্যাটি তাঁরা একেবারেই অনুধাবন করার চেষ্টা করেননি কিংবা তাঁদের নজর এড়িয়ে গেছে, তা হল বাংলা ভাষার বর্তমান পরিস্থিতির সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক শর্তাবলীর বাধ্যবাধকতা বিবেচনা। বাঙলা ভাষার অঞ্চল একাধিক কর্তৃত্বের পক্ষপুটে আছে, একাধিক বৈধতার পরিমণ্ডলে আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন বানান সংস্কার করা হয় এবং বানানের নিয়ম প্রবর্তন করা হয়, তখন সেই বিশ্ববিদ্যালয়টি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মান্য প্রতিষ্ঠান ছিল এবং তখন বাংলা ভাষাকে কোনো সাংবিধানিক কিংবা আইনগত ছত্রছায়াকে মান্য করতে হয়নি। কতিপয় ভাষিক যুক্তিই ছিল নিয়ম প্রবর্তনের মূল প্রেরণা।

**৩.০ সাংবিধানিক মাত্রা ও কর্তৃত্বশীলতা**

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়ম প্রবর্তনের পর বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা ভাষায় সংবিধান প্রণয়নের মতো ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে যায় পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় সংবিধানের ছত্রছায়ায়। ফলে বাংলা ভাষা উন্নয়নের জন্য, সংস্কারের জন্য কিংবা পরিবর্তন ইত্যাদির জন্য সাংবিধানিকতার মাত্রা বানানের প্রামাণিকতা বিবেচনায় স্থান পায়।

একটি রাষ্ট্রীয় সংবিধান যে কোনো রাষ্ট্র কিংবা সমাজের জন্য সবচেয়ে প্রামাণিক কর্তৃত্বশীল বা (authentic) অথেনটিক দলিল হয়ে উঠে। বর্তমানে বিরাজমান দুটো দলিলের মধ্যে ভিন্নতা আছে।

ভারতীয় সংবিধান ১৯৮৩ সালে বাংলায় অনূদিত হয়। (প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল-২০০০ (১৯৮৩), দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল ৫০০০ (১৯৮৭) আর 'বাংলাদেশের সংবিধান' প্রথম থেকে দ্বিভাষিক হয়ে প্রকাশিত হয়। কর্তৃত্বশীলতা আরোপিত হয় বাংলা ভাষার পক্ষে, মাঝখানে একবার কর্তৃত্ব আরোপিত হয়েছিল ইংরেজির উপর, এখন তা আবার বাংলায় আরোপিত হয়েছে। অর্থাৎ অর্থগত কিংবা ব্যাখ্যাগত কোনো ভিন্নতার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা প্রাধান্য লাভ করবে। ভারতীয় সংবিধানের কর্তৃত্ব বাংলা ভাষায় নেই। বলাবাহুল্য, দুটো সংবিধানই সাধুরীতিতে লিখিত।

### ৪.০ বাংলা বানানে আইনগত তাৎপর্য

### ৪.১ বানানের আইন ও আইনের বানান

বাংলা বানানের আইন অর্থাৎ নিয়ম আছে, তা আমরা জানি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বানানের নিয়ম তৈরী করেছে। এই নিয়মগুলোকে মান্য করার জন্য চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছে। তবে এ চুক্তি আইনের চুক্তি নয়, এক ধরনের সামাজিক চুক্তি। কারণ তখনকার যুগে বানান নিয়ে রাষ্ট্রীয় দুশ্চিন্তা ছিল না, প্রাতিষ্ঠানিক দুশ্চিন্তা ছিল। তাই এসব প্রতিষ্ঠান বানানের নিয়ম তৈরীর জন্য এগিয়ে এসেছে। আমাদের দেশের মতো অন্যত্রও এ ধরনের বানানের নিয়ম তৈরী হয়েছে।

### ৪.২ চুক্তি, যুক্তি ও সংকেত

বানানের এসব নিয়মে অস্তিত্বশীল থাকে এক ধরনের চুক্তি, যুক্তি ও সংকেত মান্য করার উপযোগিতা উপলব্ধির ইতিবাচক মানসিকতা থেকে। চুক্তি না মানলে সংকট সৃষ্টি হয়, যুক্তি না মানলে সংঘাত হয়, অনুরূপভাবে সংকেত না মানলেও সংকট হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, চুক্তি না মানলে বিয়ে ভেঙ্গে যায়, যুক্তি না মানলে স্বৈরাচার বৃদ্ধি পায়, সংকেত না মানলে সমাজবন্ধন ক্ষুণ্ন হয়।

### ৪.৩ সংবিধানের উদ্‌ঘোষণ ও সাংবিধানিক প্রাধান্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩-ধারায় 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা'- এই কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর সংবিধানের ৭-এর (২) উপধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, সংবিধানের প্রাধান্যবিষয়ক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি নিম্নরূপ:

(৭) (২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।



বলা বাহুল্য, একথা মনে রাখা উচিত যে, কোনো দেওয়ানী আইন কিংবা ফৌজদারী আইন কিংবা কোনো চুক্তি-দলিল যদি সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্য হয়, তাহলে যেটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ তা বাতিল হবে।

'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' শীর্ষক দ্বিতীয় ভাগের ২৩ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে:

'২৩। রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।'

**এই ধারার ২১ (১) ধারায় বলা হয়েছে:**

'সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।' বিচার্য বিষয় হচ্ছে, বাংলা ভাষা এদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার কিনা। যদি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার বলে স্বীকৃত হয়, তবে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, তার পরিপোষণ করা, তার উন্নয়নের ব্যবস্থা করা 'প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।'

### ৫.০ প্রামাণিকতা ও নিয়মের দ্বন্দ্ব

বানানে সমতা প্রতিষ্ঠার কথা বলতে গিয়ে পুরাতন দলিল, পুরাতন সাহিত্যকৃতি কিংবা মূল উপকরণের প্রামাণিকতার ব্যাপারটি তলিয়ে দেখা হয়নি। গত পঁচিশ বছর কিংবা পঞ্চাশ বছর ধরে যে সাহিত্য বিরচিত হয়েছে, যেসব দলিল লেখা হয়েছে, যেসব কাবিননামা, যেসব চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে, সেগুলোর প্রামাণিকতা রক্ষা করতে গেলেই পুরাতন বানান সংরক্ষণ জরুরী হয়ে পড়ে। যেকোনো লেখকের মূলরচনা সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও নতুন বিধান অকার্যকর। ফলে সমতাবিধানের নিয়ম কোথায় প্রযুক্ত হবে কোথায় হবে না, তা বানানের নিয়মে উল্লেখিত নেই। এই না থাকাটাই মূল উপকরণের প্রামাণিকতা নষ্টের কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে নতুন বানান নীতি। এ ধরনের অপরিণামদর্শী নিয়ম সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং বাংলা ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাই করছে।

### ৬.০ উপসংহার

চলন্তিকা অভিধানে রাজশেখর বসু যা নির্ধারণ করেছিলেন, তার ব্যতিক্রমের কারণ অনুসন্ধান ভাষাতাত্ত্বিক কারণেই জরুরী। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাঙলায় আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারণা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রসারিত হয়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রথম ছাত্র।

পরবর্তীকালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেন এক্ষেত্রে আসেন। বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ধ্বনিমূলীয় বিশ্লেষণের ব্যাপক কাজ তখনও হয়নি। শতাব্দীর ছয়ের দশকে মুনীর চৌধুরী ও চার্লস ফার্গুসন বাংলা ভাষার ধ্বনিমূল নির্ধারণ করে সাংগঠনিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। সে-ক্ষেত্রে দেখা গেল, বাঙলায় স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘত্ব ধ্বনিক (Phonetic), ফোনেমিক (Phonemic) মানে ধ্বনিমূলীয় নয়।

অর্থাৎ ধ্বনিমূল হিসেবে স্বরের দৈর্ঘ্য গণনযোগ্য নয়, তবে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে তা গণনযোগ্য। এ জ্ঞান প্রচারিত, প্রসারিত ও বিকৃত হয়ে উপস্থাপিত হল পরবর্তীকালে। বলা হল, যেহেতু বাংলায় স্বরধ্বনিতে হ্রস্ব-দীর্ঘ নেই, সুতরাং হ্রস্বতা ও দীর্ঘত্ববাচকতা পরিহার করে সমতা তৈরী করলে পরিকল্পনার দিক থেকে সহজ হয়। কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানীও এ ধরনের সরল সিদ্ধান্তকে প্রশ্রয় দেন। ফলে হ্রস্ব 'কি' আর দীর্ঘ 'কী' একরকম দেখা জায়েজ হতে থাকে। অথচ মনে রাখা দরকার ছিল, হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব যখন প্রয়োজন হবে, তখন বর্জনকারীরা তা অর্জন ও বাস্তবায়ন করবেন কি করে!

উচ্চারণ অনুযায়ী বানান কিছুটা হয়, কিছুটা হয় না। এ সূত্রও তারা উদাসীনভাবে উপেক্ষা করেছেন। যতদূর মনে হয়, ভাষাতাত্ত্বিক এই সংশয় থেকে বিশেষণধর্মী 'ী'-কার সর্বনামের হ্রস্ব 'ি' কারের স্থান দখল করে নেয়।

একবার দখল করে নিলে সেটা বেদখল করা আইনের সদিচ্ছ প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। ভাষাবিজ্ঞানীরা বিশেষণ আর সর্বনামের পার্থক্য বুঝেন না, তাতো বলা যায় না। এটা স্রেফ ঔদাসীন্য ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। ঔদাসীন্য সচেতনতার বিপরীত কোটরের জিনিস।'

**সহায়ক গ্রন্থ**

১. বসু, রাজশেখর (১৯৫৩) 'বাংলা ভাষার গতি;' লঘু গুরু, কলকাতা

২. মুসা, মনসুর (২০০৫) বানানে সাংবিধানিকতা ও প্রাতিষ্ঠানিক বানান, এখন (সাপ্তাহিক), ২য় বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা- পৃঃ ০৭, ঢাকা।

৩. মুসা, মনসুর (২০০৫) বাঙলা ব্যাকরণের Ki নিয়ে Ki করা যায়! নিরীক্ষা, জুন ২০০৫, ১৩৫তম সংখ্যা, ঢাকাঃ বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট।

৪. মুসা, মনসুর (২০০৫), 'বাংলা শব্দের বানান দেশি-বিদেশি শব্দের মাপকাঠি আরোপণের অসারতা', এখন (সাপ্তাহিক) বর্ষ ২ সংখ্যা ৩২, পৃষ্ঠা- ৬, ঢাকা।



ড.এমএ ইউসুফ খান

# প্রবাসে নয়াপ্রজন্মঃ মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি

শিশু জন্মগ্রহণের পর তার পরিবার, পারিপার্শ্বিক আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাথে পরিচিত হবার আগেই মাতৃভাষার সাথে পরিচিত হয়ে বেড়ে ওঠতে থাকে। মায়ের সান্নিধ্যেই বেড়ে ওঠে শিশু এবং মায়ের মুখের ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে শেখে। আসলে মাতৃভাষার ধারণাটি দেশ, জাতি ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। শিশুর মা-বাবার মূল ভাষাই তার মাতৃভাষা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে জাতিগত, ভাষাগত, প্রথাগত ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। আর এই পার্থক্যের কারণেই জাতি ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যে পৃথকভাবে প্রতিটি জাতির স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করা যায়। আন্তর্জাতিক ভাষার (ইংরেজি) সৌজন্যে মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির সাথে মনের ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যমে দেশ ও সমাজের সাথে সংযোগ ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও শিশুর প্রথম বিদ্যাপীঠ তার পরিবার, তবু দেখা যায়, যে দেশ, সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে শিশু বেড়ে ওঠে, সে সংস্কৃতির প্রতি বেশি অনুরাগী হয়। মাতৃ-সংস্কৃতির চেয়ে সেই সংস্কৃতিই তার কাছে বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে। কাজেই শিশু যে ভাষাতেই কথা বুলক না কেন বা যে সংস্কৃতির প্রতিই মনোযোগী হোক না কেন, সেটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, একজন মানুষ হিসেবে মানবিক মূল্যবোধের বীজ শিশুর ভিতরে কতটা বপন হয়েছে সেটি। শিশু যে ভাষাতে পারদর্শী, সে ভাষাতেই সে তার দেশ, জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতি এসব বিষয়ে জেনে নেবে। বাবা-মা ও অভিভাবকের দায়িত্ব হলো

শিশুকে সুস্থ, সুষ্ঠু ও সঠিক পথে পরিচালনা করা এবং তাকে দেশ, জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়া।

নিজেদের ভাষা ও জাতীয় ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং এর রেশ ধরেই ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা আমরা ভুলিনি। জাতির এই মহান আত্মত্যাগের ইতিহাস ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব আমাদের। আমাদের শিশুরা যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন বা যে দেশেই অবস্থান করুক, তাদের শেকড় বাংলাদেশে,এ কথা তাদের বুঝাতে হবে। এই নবীন প্রজন্মের মধ্যে নিজ দেশ, জাতি ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের বিশেষ করে কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের রয়েছে অপরিসীম ভূমিকা। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, প্রবাসী বাংলাদেশিদের অধিকাংশ সন্তান একুশে ফেব্রুয়ারি বা শহিদ মিনার কি তা জানে না। বাবা-মায়েরা ছেলে-মেয়েদের বাংলা শেখাতে আগ্রহী নন। তারা ইংরেজি শেখাতেই বেশি আগ্রহী। অথচ মাতৃভাষা বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা, মনের ভাষা, প্রাণের ভাষা। বিদেশ-বিভূঁইয়ে মাতৃভাষায় কথা বলার যে কী সুখ তা বলে বুঝানো যাবে না! কিন্তু দেখা যায়, আমাদের অনেক প্রবাসীই যারা স্বদেশের আলো-বাতাসে লালিত-পালিত হয়েছেন, জীবনের অনেকগুলো বছর নিজের দেশে কাটিয়ে বিদেশে গিয়ে এখন পুরোদস্তর সাহেব বনে গেছেন। তাদের বাংলায় কথা বলতে কষ্ট হয়। গর্বের সাথে বলে থাকেন- বাংলা ভুলে গেছি। তিনিই যদি বাংলা ভাষা ভুলে যান, তাহলে তার সন্তানের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? এ প্রবণতা অনেক প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যেই দেখা যায়। শিশু অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলে যাচ্ছে, তা দেখে পিতা-মাতা গর্ববোধ করছেন। তাদের ছেলে-মেয়েকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পেরেছেন এটি ভেবে পিতা-মাতা খুশিতে আপ্লুত হচ্ছেন। বাড়িতে পিতা-মাতা শিশুদের সাথে বাংলার পরিবর্তে অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই শিশুরাও ইংরেজিতে কথা বলতে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহী বোধ করে। পিতা-মাতা সগর্বে বলে থাকেন, তার ছেলে-মেয়ে বাংলা বলতে পারে না। এটি যে কত বড় লজ্জার বিষয়, তা তারা কখনো ভেবে দেখেন না। এ ব্যর্থতা তাদের সন্তানদের নয় বরং তাদের বাবা-মার। একইভাবে রয়েছে নামের বিভ্রাট। ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে ঐ দেশের কালচারের সাথে মিল রেখে শিশুর নাম রাখা হচ্ছে জন, বব, পল ইত্যাদি। শিশু বেড়ে ওঠার সাথে সাথে তার পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ, কথাবার্তা বিদেশি কালচারের অনুকরণে রপ্ত হতে থাকে। অনেক বাবা-মা রয়েছেন, যারা তাদের সন্তানকে বাংলাদেশি কমিউনিটির ছেলেমেয়েদের সাথে মেলামেশা পর্যন্ত পছন্দ করেন না। উল্টো ভিনদেশি ছেলে-মেয়েদের সাথে মেলামেশা করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেন। ফলে অল্পবয়সেই তারা 'গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড' কালচারে হাবুডুবু খেতে থাকে। প্রবাসে এ সামাজিক ব্যাধির পরিণতি খুবই ভয়াবহ। অনেক পিতা-মাতা নিছক আধুনিকতার মোহেই নিজেদের আপন বলয় ও সত্তাকে ত্যাগ করে ময়ূরপুচ্ছ পরিধাণ করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যান, যা প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। প্রবাসে এ কৃত্রিম



অহমিকাবোধের অবসান ঘটিয়ে সুন্দর ও সুস্থ কমিউনিটি গড়ে ওঠার মাধ্যমে স্বদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হোক– প্রতিটি বাংলাদেশিরই এটা কাম্য।

## মোনায়েম সরকার

# প্রিয় বাংলা ভাষা চিরজীবী হোক

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষার জন্য আমরণ রক্ত দিয়েছি। রাজপথে বলি দিয়েছি অনেক তাজা প্রাণ। বুকের রক্ত ঢেলে পৃথিবীর আর কোনো দেশ আমাদের মতো মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে পারেনি। ভাষা আন্দোলনের লড়াই আমাদের বাঁচতে শিখিয়েছে। এই লড়াইয়ের চূড়ান্ত ফসল আমাদের বহুল আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা মূলত বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলনের সোনালি ফসল। বাঙালি কবি অতুলপ্রসাদ সেন বলেছিলেন– ' মোদের গরব মোদের আশা/আ মরি বাংলা ভাষা'। বাংলা ভাষা যে বাঙালির গৌরব বৃদ্ধি করে চলেছে, তার প্রমাণ ইতোপূর্বে আমরা বহুবার পেয়েছি। সম্প্রতিও পেলাম বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতির মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাংলা ভাষার গৌরবকে আরো মর্যাদাপূর্ণ করেছে। বাংলাভাষী হিসেবে আমাদের করেছে সম্মানিত।

বাংলা ভাষা একসহস্রাব্দ অতিক্রম করে আরেকটি নতুন সহস্রাব্দের দিকে যাত্রা শুরু করেছে। শুরু থেকেই বাংলা ভাষার যাত্রাপথ নানা সংকটে আকীর্ণ ছিল– এখনও বাংলা ভাষার আকাশ থেকে সংকটের কালোমেঘ পুরোপুরি সরে যায়নি। প্রতিনিয়তই বাংলা ভাষা নানামুখী চক্রান্তের মুখোমুখি হচ্ছে। সেসব চক্রান্ত ছিন্ন করে বাংলা ভাষা এগিয়ে যাচ্ছে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। পৃথিবীতে যত ভাষা আছে, সেসব ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষাই সবচেয়ে সংগ্রামী আর প্রতিবাদী। বারবার বাংলা ভাষার



উপর আক্রমণ এসেছে, বারবারই বাংলা ভাষা সেসব আক্রমণ প্রতিহত করে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এখনো বাংলা ভাষা তার আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে অবিরাম লড়াই করে যাচ্ছে। যতদিন না বাঙালি বাংলা ভাষাকে মনে-প্রাণে ধারণ করবে, ততদিন বাংলা ভাষাকে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে যেতেই হবে। আত্মপ্রতিষ্ঠার এই অবিরাম লড়াই থেকে যেদিন বাংলা ভাষা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে সরে দাঁড়াবে, সেদিনই তার পতন অনিবার্য হয়ে উঠবে। তবে আমার কথা হলো বাংলা ভাষা মৃত্যুঞ্জয়ী। এ ভাষার কোনো লয় নেই, ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই। মাঝে মাঝে ভিনদেশি রাক্ষুসে ভাষা এসে বাংলা ভাষাকে গ্রাস করতে চায় বটে; কিন্তু বাংলা ভাষা এমনই এক মৃত্যুহীন ভাষা যে, একে কিছু সময়ের জন্য বন্দী করা যায়; কিন্তু চিরতরে ধ্বংস করা যায় না। অবিনশ্বর বাঙালি জাতিসত্তার মতো বাংলা ভাষাও অমর, অজর, মৃত্যুহীন।

মুঘল আমলে ফারসি যখন 'রাজভাষা' হিসেবে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাংলা ভাষা তার নিজস্ব ভূখণ্ডেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে। রাজার অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য এবং সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার জন্য এই ভূখণ্ডেরই একদল লোক ফারসি ভাষাচর্চা করতে ওঠে-পড়ে লাগে। আরেকটি দল থেকে যায় দরিদ্র বাংলা ভাষার কাছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ফারসি ভাষা বাংলা ভাষার উপর চাবুক মারতে থাকে, ফারসি ভাষা বাংলাকে গ্রাস করতে চায়, কিন্তু পারে না। মরতে মরতে বেঁচে যায় বাংলা ভাষা। মুঘলদের পরে ইংরেজরা এলে বাংলা ভাষার উপর শুরু হয় নতুন অত্যাচার। তখনও বাংলা ভাষার বন্ধনকে উপেক্ষা করে, ভুলে গিয়ে বাংলা ভাষার মহিমা একদল সুবিধাভোগী ইংরেজি ভাষাকে সাদরে গ্রহণ করে। তারা হয়ে ওঠে 'কালো সাহেব'। তাদের ভাবখানা এমন যেন বাংলা তাদের বৈমাত্রেয় বোন। তারা এড়িয়ে চলতে থাকে বাংলা ভাষার সংস্পর্শ। বাংলাকে তারা শুধু অনাদর আর অবহেলা করেই ক্ষান্ত হলেন না, তারা বাংলাকে 'ল্যাংগুয়েজ অব ফিসারম্যান' বলতে শুরু করেন। এদের মধ্যে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৯২৪-১৮৭৩ খ্রি.)-ও ছিলেন। কিন্তু যখন তার মোহ ভঙ্গ হয়, তখন তিনি ঠিকই এসে মুখ লুকান বাংলা ভাষার আঁচলতলে। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথম প্রথম ইংরেজি ভাষাচর্চা শুরু করেছিলেন। কিন্তু তিনিও অবশেষে আশ্রয় নিয়েছেন বাংলার কুঁড়েঘরে।

বাংলা ভূখণ্ড যখন ব্রিটিশমুক্ত হলো তখন আশায় বুক বাঁধে বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষা ভাবতে শুরু করে তার দুঃখের রাত বুঝি শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু না, নতুন করে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় উর্দু নামের এক অদ্ভুত ভাষা। উর্দু বাংলার বিরুদ্ধে এমনই ষড়যন্ত্র শুরু করে যে, বাংলা ভাষার তখন নাভিশ্বাস ওঠে যায়। ফারসি, ইংরেজি ভাষার উৎপাত বাঙালিরা মেনে নিলেও উর্দুর বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। বলতে গেলে, উর্দুর হাত থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার আন্দোলনই বাঙালির প্রথম ভাষা রক্ষা বিষয়ক আন্দোলন। এর আগে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার জন্য কোনো সংঘবদ্ধ আন্দোলন আর গড়ে ওঠেনি। উর্দুর বিরুদ্ধে চারবছর বাঙালি রক্তঝরা ভাষা আন্দোলন করে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে যে আন্দোলন শুরু হয়, তার বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি। এরমাঝে ঘটে যায়

অনেক ঘটনা। অনেক প্রাণ বিসর্জিত হয় রাজপথে। জেল-জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেন অনেক ভাষাসৈনিক। অসংখ্য মানুষের প্রাণদান আর নির্যাতনের বিনিময়ে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পায় বাংলা ভাষা। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দই সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যে মুহূর্তে বাংলা ভূখণ্ডে বাংলা ভাষা প্রথম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পায়।

বাংলা সাহিত্যের একমাত্র প্রাচীন গ্রন্থ 'চর্যাপদ'। চর্যাপদের ভাষা বাংলা ভাষা বলেই আজ স্বীকৃত। চর্যাপদের ভাষা দিয়েই বাংলা ভাষার বয়স যদি হিসাব করা হয়, তাহলে দেখবো যে যুগে চর্যাপদ রচিত হয়েছে, সে যুগে অভিজাত কেউ বাংলা ভাষার চর্চা করেননি। চর্যাপদ যারা রচনা করেছিলেন, তারা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন পলাতক মানুষ। তারা স্থির হয়ে কেউই বাংলা ভাষাচর্চা করার সুযোগ পাননি। যদি পেতেনই তাহলে শুধু একখানা গ্রন্থ রচনা করেই তারা ক্ষান্ত হতেন না, তাদের হাত দিয়ে আমরা অসংখ্য গ্রন্থ পেতাম। তাছাড়া চর্যাপদ আবিষ্কারের মধ্যেও আছে চমৎকার বিস্ময়। বাংলা ভাষার গ্রন্থ বাংলা ভূখণ্ডে পাওয়া গেলো না, এটা পাওয়া গেলো নেপালে। কেন বাংলা ভাষার গ্রন্থ নেপালে আবিষ্কৃত হলো– এ সম্পর্কেও নতুন করে গবেষণা হওয়া দরকার।

**মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিম তাঁর 'নূরনামা' গ্রন্থে বলেছিলেন–**

'যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
যে সবে কিবা জন্ম নির্ণয় ন জানি।"

কেন আব্দুল হাকিম এ কথা বলেছিলেন, তা আজ অনেকেরই জানা। কেননা তখনও একদল বাংলা ভাষাবিদ্বেষী মানুষ ছিলেন, যারা বাংলা ভাষাকে মোটেই সুনজরে দেখতেন না। বাংলা ভূখণ্ডে একশ্রেণির মানুষ বাস করে, যারা এদেশের খায়, এদেশের পরে; কিন্তু স্বপ্ন দেখে ইরান, তুরান, ইউরোপের পাকিস্তানের। এরা পরগাছার মতো। এদের ভাষাপ্রেম তো নেইই, দেশপ্রেমও নেই। দেশপ্রেম আর ভাষাপ্রেম পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যার দেশপ্রেম থাকে, তার ভাষাপ্রেমও থাকে। যার দেশপ্রেম থাকে না, তার ভাষাপ্রেমও লোপ পায়।

যুগে যুগে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যে কত রকম ষড়যন্ত্র হয়েছে, তার দুই–একটি নমুনা তুলে ধরতে চাই। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'রওশন হেদায়েত' নামে একটি পত্রিকা তার 'লেখক-লেখিকাগণের প্রতি' নিবেদন করে বলে– 'হিন্দুয়ানী বাঙালি না হইয়া দোভাষী অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষা প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। অ-ইসলামিক শব্দ যেরূপ স্বর্গ, নরক, যুগ, ত্রিভুবন, ঈশ্বর, ভগবান, নিরঞ্জন, বিধাতা ইত্যাদি প্রবন্ধে থাকিলে, সে প্রবন্ধ বাহির হইবে না। লেখকগণের খেয়াল করা দরকার, বোজর্গানে দীন যখন এদেশে ইসলাম প্রচার করেছিলেন, তখন তাঁহারা এদেশের ভাষার মধ্যে ইসলামিক ভাষা প্রবেশ করাইয়া সর্বসাধারণকে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। 'রওশন হেদায়েত'রও প্রধান উদ্দেশ্য ইসলাম শিক্ষা দেওয়া; কাজেই কালামে কুফর প্রকাশ হওয়া উচিত নয়।' অর্থাৎ যারা মনে করে আরবি, ফারসি, উর্দু ছাড়া অন্য ভাষা গ্রহণ করলেই বাংলা ভাষার চরিত্র নষ্ট হয়, তারা প্রকারান্তরে বাংলা ভাষারই শত্রু। পৃথিবীতে হাতে গোনা কয়েকটি ভাষা ছাড়া সব ভাষার মধ্যে প্রচুর 'ঋণ শব্দ' আছে। বাংলা ভাষার মধ্যেও প্রচুর 'ঋণ শব্দ' ঢুকে



পড়েছে, কিংবা বলা যায়– নিজের প্রয়োজনেই বাংলা ভাষা বিদেশি বলতে হয়– আল্লাহ, খোদা, নামাজ, রোজা, এবাদত, রাসুল, আদম- এগুলো বাংলা শব্দ নয় এবং আমাদের ভূখণ্ডের শব্দও নয়। জেনে-শুনেই আমরা এই শব্দগুলো আত্মীকৃত করেছি।

অধ্যাপক যতীন সরকার তার একটি প্রবন্ধে (বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক নিয়ে হিন্দু-মুসলমানি কাণ্ড) বলেছেন– 'বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু?'– এই অদ্ভুত প্রশ্নটি তো উনিশ শতকেই ওঠেছিল। সে সময়েই তো নবাব আবদুল লতিফ মুসলমানের মাতৃভাষা যে উর্দু, সে বিষয়ে স্থির নিশ্চিত ছিলেন। তবে, নিম্নশ্রেণির যে সব মুসলমান উর্দুকে ঠিকমতো রপ্ত করে ওঠতে পারেনি, তাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তিনি 'মুসলমানি বাংলা'র সুপারিশ করেছিলেন। সেই মুসলমানি বাংলা হবে প্রচলিত বাংলা থেকে আলাদা, সংস্কৃতের বদলে এতে থাকবে সেইসব আরবি-ফারসি শব্দ যেগুলো উর্দু ভাষায় বহু ব্যবহৃত। নবাব আবদুল লতিফরা হয়তো বিশ্বাস করতেন যে, এরকম মুসলমানি বাংলার পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে 'আতরাফ' মুসলমানরা একসময় উর্দুর মঞ্জিলে পৌঁছে 'আশরাফ'দের কাতারে শামিল হয়ে যেতে পারবে।'

নবাব আবদুল লতিফগংদের মতো এরকম আরো অসংখ্য ষড়যন্ত্র ও নীলনকশা একদিন বাংলা ভাষাকে ঘিরে ধরেছিল। দুর্মর বাংলা ভাষা সেসব অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে আজ গৌরবের মর্যাদায় আসীন। এখানে অবশ্য একটি কথা না বললেই নয় যে, বাংলা ভাষাই এশিয়া মহাদেশে প্রথম ভাষা, যে ভাষার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হওয়ার মাত্র তেরো বছরের মাথায় এই দুর্লভ পুরস্কারে ভূষিত হন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষা, রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যে লড়াই শুরু হয়েছিল ও রক্ত ঝরেছিল, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে তা মর্যাদা পায় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর। সারা পৃথিবীর মানুষ আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে জানতে ও বুঝতে শিখছে। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা খবর। যে ভাষাকে একদিন গলা টিপে হত্যা করার চক্রান্ত হয়েছিল সেই ভাষার সম্মানার্থেই আজ পালিত হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। এরচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার আর কী হতে পারে! তবু দুশ্চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে, এখনো বাংলা ভাষা সর্বস্তরে সমানভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া ক্রীতদাসেরা এখনও বাংলার বদলে ইংরেজি আওড়াতে বেশি সম্মানিত বোধ করে। প্রতিক্রিয়াশীল, মৌলবাদীরা এখনও স্বপ্ন দেখে এদেশে আবার ফিরে আসবে আরবি, ফারসি, উর্দু মিশেল খিচুড়ি ভাষা, বাংলা বিদ্বেষী এই কুলাঙ্গারেরা শুধু বাংলা ভাষারই শত্রু নয়, এরা বাংলাদেশের শত্রু। এদের যথাযথভাবে প্রতিহত করতে হলে 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন' করা এখন সময়ের দাবি। যদিও এই দাবি অনেক আগে থেকেই উঠেছে।

বর্তমান সরকার বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ বান্ধব সরকার। বঙ্গবন্ধুর হাতেই নির্মিত হয়েছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উপাখ্যান। বাংলা ভাষার বৈশ্বিক মর্যাদাও

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার হাতে। যদি আমরা সত্যিই সত্যিই বাংলা ভাষাকে দেশের মাটিতে এবং বিদেশিদের কাছে মূল্যবান করে তুলতে চাই, তাহলে এখনই সুযোগ সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন ঘটানো– কেননা এমন সুযোগ অতীতে কখনো আসেনি। ভবিষ্যতেও আসবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। বাংলা ভাষা চিরজীবী হোক, আত্মমর্যাদায় বলীয়ান হোক আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষা।

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭



মোহাম্মদ আবদুল হাই

# বিশ্বায়নে বাংলা ভাষা পরিস্থিতি

'বিশ্বায়ন' ধারণাটির আড়ালের রূপটি জটিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমীকরণের ফসল। বিশেষ অভিসন্ধিমূলক। Webstar Dictionary-র ১৯৬২ সংস্করণে প্রথম দৃষ্ট আপাতমধুর এই 'বিশ্বায়ন' নামক শব্দটি বিশ শতকের আশি ও নব্বই দশকে জ্ঞান ও বৌদ্ধিক চিন্তার বিচিত্র ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলেও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে পুঁজিবাদি বিকাশের সূচনাকাল থেকেই।

বিশ্বায়নের চরিত্র আগ্রাসী। অর্থনৈতিক শোষণের সাথে সাথে এর থাবা মেলে দেয় দুর্বল দেশ-জাতি-গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির উপর। পুরনো ঔপনিবেশিক দেশগুলোকে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠিত মদদপুষ্ট দুর্বল চরিত্রের ছায়া গণতান্ত্রিক সরকার টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে এই আগ্রাসন চলে। এটা যেমন অর্থনৈতিকভাবে বিশ্বায়নের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে ইংরেজিকরণের মাধ্যমে একভাষিকতার প্রতিষ্ঠা করা এবং ইংরেজি ধরনের জীবনাচরণের অনুকূল বৈচিত্র্যহীন সাংস্কৃতিক আবহাওয়া প্রতিষ্ঠা করা স্বাভাবিক সৃষ্টিধর্মের পরিপন্থী, তাই তা পরিত্যাজ্য। কেননা, বিশ্বায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষা প্রসারের নামে পৃথিবী ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে এক অনিবার্য সৃষ্টিহীনতা ও বন্ধ্যাত্বের দিকে। বিশ্বে ইংরেজি আজ এক আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ভাষার নাম। এ ভাষা ক্রমশ হটিয়ে দিচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সম্ভাবনাময় ভাষাসমূহকে। এসব দেশের প্রায় সকল শিক্ষিত নাগরিক আজ বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বনাগরিক হওয়ার প্রত্যাশায় আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং ক্ষমতার কাছাকাছি ও ক্ষমতাবানদের পঙক্তিতে আসার আকাঙ্ক্ষায় ইংরেজি ভাষা অধ্যয়নে অতিতৎপর হয়েছে এবং স্যাটেলাইট চ্যানেলে প্রচারিত

পাশ্চাত্যের জীবনাচরণ অভিমুখী অনুষ্ঠানসমূহ প্রত্যক্ষ করে অভ্যস্ত হওয়ার প্রাণান্তকর চেষ্টায় মেতে উঠেছে। এরই প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত বিলীয়মান হচ্ছে সে সব দেশের জাতীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহ এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গগুলো।

উন্নয়নশীল দেশের ভাষাসমূহের ক্রমাগত হারিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে আমাদের ভয়াবহ তথ্য সরবরাহ করেছে বিখ্যাত 'গার্ডিয়ান পত্রিকা'। এই পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রচলিত ছ'হাজার ভাষার মধ্যে আগামী ১০০ বছরে অর্ধেক ভাষা অর্থাৎ ৩০০০ ভাষা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অর্থাৎ তদের হিসাব অনুযায়ী প্রতি দু' সপ্তাহে বিশ্বের কোথাও না কোথাও একটি ভাষার অপমৃত্যু ঘটছে। 'দি ল্যাংগুয়েজেস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' নামে পৃথিবীর ভাষাসংক্রান্ত একটি প্রকাশনায় ২০০৩ সালের জরিপ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে বর্তমানে ছয় হাজারের মতো ভাষা আছে। এগুলোর মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ ভাষা-অর্থাৎ মাত্র শ'তিনেক ভাষা দিয়েই পৃথিবীর ৯০ শতাংশ মানুষ তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে। বাকি সাড়ে পাঁচ হাজার ভাষার মধ্যে অনেকগুলো, বিশেষ করে যেসব ভাষাতে কথা বলার লোক একলাখের উপর নেই, সেগুলোর মধ্যে বেশকিছু এখন অবলুপ্তির মুখে। গবেষণায় দেখা গেছে- বিগত ১০০ বছরে তিন হাজার ভাষার বিলুপ্তি ঘটেছে। এই হিসাবে আজকের পৃথিবীতে প্রতি দুই সপ্তাহে অবলুপ্ত হতে যাচ্ছে একটি করে ভাষা। দেখা যাচ্ছে- অবলুপ্তির মুখোমুখি জীবজন্তু, পশু-পাখি, গাছপালা এগুলোর চাইতেও দ্রুতগতিতে এবং নিশ্চিতভাবে অবলোপ পাচ্ছে মানুষের ভাষা। এখন পর্যন্ত ভাষাবিদদের তালিকাভুক্ত পৃথিবীর ৬০৬০টি ভাষার মধ্যে ৫১টি ভাষা আছে, যেগুলোর প্রতিটি মাত্র ১ জন করে লোক কথা বলে। এই একান্নটির মধ্যে শুধু অস্ট্রেলিয়াতেই ২৮টি এরকম ভাষা রয়েছে। এছাড়াও মাত্র ১০০ জন লোক কথা বলে এরকম ভাষা আছে ৫০০টি। ১৫০০ ভাষা আছে যার প্রতিটিতে কথা বলার লোক আছে ১০০০ জনের কম। আরও ৫০০ ভাষা আছে যেগুলোর প্রত্যেকটিতে ১০০,০০০ জনের চেয়ে কম লোক কথা বলে। বর্তমান বিশ্বের লোকসংখ্যা ৬০০ কোটি হলেও এর ৪৭০ কোটির বেশি লোকের মাতৃভাষা মাত্র ২২টি। এসব ভাষাভাষীর সংখ্যা বর্তমানে সর্বনিম্ন ৫ কোটি ও সর্বোচ্চ ১২৫ কোটি। বাংলাভাষা পৃথিবীর চতুর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মাতৃভাষা। এ ভাষা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, ত্রিপুরা, মণিপুর, আসাম, আরাকান এবং বহির্বিশ্বের যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও আরব দেশগুলিতে বাংলাভাষী বহু লোক রয়েছেন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী দাপটের ফলে সৃষ্ট বিশ্ব জুড়ে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার আড়ালে ইংরেজি ভাষার আগ্রাসন, জাপান অর্থনৈতিকভাবে ক্রমশই শক্তিশালী গতিতে এগিয়ে যাওয়ায় বিশ্বে জাপানি ভাষার অগ্রসরমানতা কিংবা ভারতের পরাশক্তির দিকে ক্রশশ এগিয়ে যাওয়ার ফল-সৃষ্ট ভাষার আগ্রাসন বিশেষত জনসংখ্যাবহুল প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাাদেশের বাংলাভাষা লোপ পেয়ে বসবে, এরকম আশঙ্কা করবার কারণ দেখা যাচ্ছে না। কারণ পৃথিবীতে এই একটি মাত্র বিরল ব্যতিক্রম দেশ, যে দেশের মানুষ মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠার জন্যে জীবন পর্যন্ত দান



করেছে। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে বাঙালির গৌরবময় আত্মদানের স্মৃতিবাহী চেতনা ও উদ্দীপনা এখন বাঙালি আর বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি এখন সারাবিশ্বের ক্ষুদ্র ভাষাগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রধান প্রণোদনা দিবস। তাছাড়া সাহিত্যের গুণগতমান ও উৎকর্ষের বিচারেও বাংলা ভাষা বিশ্বের যে কোনো সমৃদ্ধ ভাষার সঙ্গে তুলনীয় ও বিচার্য। এছাড়াও বাংলাভাষায় জন্মগ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিশ্বমানের কবি-যার প্রতিভার দ্যূতিতে এ ভাষা প্রাদেশিকতার মাত্রা অতিক্রম করে বিশ্বমাত্রিকতায় উন্নীত হয়েছে এবং যার প্রতিভা নৈপুণ্যে এ ভাষা লাভ করেছে এশিয়ার সকল ভাষার মধ্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির অনন্য গৌরব। যে ভাষার অধিকার ও গৌরব- যে ভাষা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিশ্বের বিরল ভাষা আন্দোলন সংগঠিত হয়, যে ভাষার বিলুপ্তি বিশ্বায়নের সৃষ্ট কুমতলবের কবলে পড়ে বিলুপ্ত হবে এমন আশঙ্কা করা সঙ্গত নয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। কৌলিন্যে এবং বয়সে এ ভাষা ইংরেজি ভাষার চেয়ে পিছিয়ে নেই। সমসাময়িক ইংরেজি সাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সমান্তরালভাবে তুলনা করলে উনিশ শতকের ইঙ্গ-বাঙালি সাহিত্যের শিল্পমূল্য আনুপাতিক হারে লঘু হলেও বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের এই প্রয়াস একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাছাড়া প্রায় একশতাব্দী ধরে এই সাহিত্য সমকালীন বিশ্বের দুই সাহিত্যধারার মধ্যে সংযোগকারী হিসাবেও কাজ করেছে। মধ্যযুগের ইউরোপীয় মাটিতে ভারত সম্পর্কে সবচেয়ে বিস্ময়কর চিন্তার অবতারণা করেন মহাকবি দান্তে তার 'দি ডিভাইন কমেডিয়া' মহাকাব্যে বাংলাদেশের গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলকেই 'সভ্যজগতের শেষ সীমানা' হিসাবে নির্দেশ করেছেন। রেনেসাঁস এবং সাম্রাজ্যবাদের যৌথ প্রতীক হিসেবে টমাস স্টিভেনস যখন এদেশে এসেছিলেন, তার অনেক আগেই দক্ষিণ ইউরোপের মত ইংল্যান্ডের সাহিত্যের মধ্যে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আভাস ফুটে উঠেছে, যার উদগাতা স্বয়ং জিওকে চসার। এলিজাবেথীয় যুগে সেই আভাস সুস্পষ্ট একটি মূর্তি পরিগ্রহ করেছে, যার বাস্তব প্রকাশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠায়। স্টিভেন্সের পরবর্তী আগন্তুক র‍্যালফ ফিচের 'ভারত-প্রতিবেদন' ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠার প্রেরণা যুগিয়েছিল। এলিজাবেথীয় লেখকদের মধ্যে সিডনি অ্যাসচাম এবং স্পেনসারের লেখায় ভারতের উল্লেখ খুব বেশি না থাকলেও পরবর্তীদের মধ্যে মার্ল্যো ব্ল্যমন্ট ও ফ্লেচার প্রাচ্য তথা ভারত সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পরিবেশন করেছেন। অতঃপর স্বয়ং শেক্সপিয়র তাঁর মার্চেন্ট অব ভেনিস, কিং লিয়র, হ্যামলেট প্রভৃতি নাটকের মধ্যেও ভারতীয় দর্শন চেতনার অনুরূপ ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন। শেক্সপিয়রের সমসাময়িক প্রবন্ধ-সাহিত্যের জনক ফ্রান্সিস বেকনও অনুরূপ ভারত মনষ্কতা দেখিয়েছেন। রেনেসাঁস থেকে রোমান্টিক যুগের মধ্যবর্তী দু'শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের স্থান ছিল অটুট। মিল্টন বারবার ভারতের এমন কি বাংলাদেশেরও উল্লেখ করেছেন নানা প্রসঙ্গে। পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য প্রধান লেখকদের মধ্যে ড্রাইডেনের নামও উল্লেখ করা যায়। স্টিভেনস এবং ফ্লিচের পর এদেশে উল্লেখযোগ্য ইংরেজ কর্মচারী এবং ভ্রমণকারী যাঁরা এদেশে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে স্যার টমা

রো-র নাম সুপরিচিত। তিনি ছাড়া টেরি, উইলিয়াম বার্টন, উউলিয়াম মেথোলড, জন ফ্লায়ার, জন লিডেন, জর্জ স্মিথ, আলেকজান্ডার, হ্যামিলটন, জে এইচ প্রিন্সেস, হোরেস হেম্যান উইলসন, এইচ এম পার্কার, আর্নেস্ট জোনস, ডি এল রিচার্ডসন, রবার্ট ওরমে, জন জ্যাফনিয়া হলোএল, চার্লস হ্যামিলটন, উইলিয়াম হিকি, জেমস আগাস্টাস হিকি, এলিজা ফে, হ্যারি ভেরেলস্ট, জেমস ওয়াইজ, জেমস টেলর, জেমস ফরবেস প্রমুখের নামও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। এঁদের স্মৃতিকথা পত্রাবলী এবং অন্যবিধ ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্যচর্চার বীজ বপন করেছিল।

## বহির্বিশ্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক বাংলাচর্চার সুযোগ

ব্রিটেনের প্রখ্যাত ও ঐতিহ্যপূর্ণ যে প্রতিষ্ঠানটিতে বাংলাচর্চা ও গবেষণার সুযোগ আছে, তার নাম স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ। কবি ও অধ্যাপক উইলিয়াম রাদিচে এর মুখ্য আকর্ষণ। তিনি নিজে অনুবাদ করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ'-কাব্য। আর এমনকি রবীন্দ্র নাটক 'ডাকঘর' প্রযোজনাও করেছেন। লন্ডনে আছে রবীন্দ্রচর্চার কেন্দ্র। শান্তিনিকেতনের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানের সংগঠক এলমহার্স্ট কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। নিযুক্ত হয়েছিলেন জে.ডি আন্ডারসন নামে এক গবেষক। যিনি ঢাকা শহরে কাটিয়েছিলেন বেশ কিছুকাল।

আমেরিকার দক্ষিণ এশীয় ভাষা প্রবাসী বাঙালিদের আয়োজিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রকশিত পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেও এসব ক্ষেত্রে পরোক্ষ কিছু বাংলাচর্চা হয়ে থাকে। আমেরিকায় বাংলাচর্চার প্রধান কেন্দ্র শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া ভাষা ও সভ্যতা বিভাগ। বহুদিন পর্যন্ত এই কেন্দ্রের প্রাণপুরুষ ছিলেন প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত এডওয়ার্ড ক্যামেরন ডিমক (১৯৩০-২০০১)। ইনি বৈষ্ণব পদাবলীর যে অনুবাদ প্রকাশ করেন, তার শিরোনাম 'Parise of Krishna' তাঁর অনুদিত অন্য গ্রন্থটি হল বৈষ্ণব সাহিত্যের আকর গ্রন্থ 'চৈতন্য চরিতামৃত'। এই গ্রন্থটির প্রকাশক হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলার সহজিয়া বৈষ্ণবকাল বিষয়ক তাঁর গ্রন্থ The Place of Hidden Moon। তাঁর অনুদিত বাংলায় মধ্যযুগের আখ্যান গ্রন্থ The Thief of Love and Other Stories এছাড়া বিদেশিদের বাংলা কথোপকথন শিক্ষার জন্য তিনি যে অসাধারণ গ্রন্থটি রচনা করেছেন- সেটিও অন্যান্য গ্রন্থের মতো খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই প্রখ্যাত বাংলাপ্রেমীকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে সম্মানিত করেছে।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত কেন্দ্রের কর্ণধার অধ্যাপক ক্লিনটন বি. সিলি বাংলার আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম A Poet Apart। এজন্য তিনি 'আনন্দ পুরস্কার' পেয়েছেন। এছাড়া



নৃতত্ত্বের গবেষক রন ইন্ডেন হিন্দুদের জাতি সম্পর্ক নিয়ে এবং অধ্যাপক র‍্যালফ নিকোলাস বাঙালিদের সামাজিক নৃতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ও রবীন্দ্রসাহিত্যের উপর কাজ করেছেন শ্রীমতী ম্যারী এস লোগোা। রবীন্দ্র অনুবাদে দক্ষ শ্রীমতী লোগো কৃতিত্বের সঙ্গে 'নষ্টনীড়'-এর অনুবাদ করেছেন- 'The Broken Nest' শিরোনামে।

এই প্রতিষ্ঠানে ভাষাবিজ্ঞান ও দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী মিরিয়াম ক্লেম্যান অনুবাদ করেছেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। বাংলা ভাষাবিজ্ঞানের নানাদিক নিয়েও তিনি কাজ করেছেন। গবেষক রিকি সলোমনের বিষয় ছিল 'মঙ্গলকাব্য' আর রুটা পেপ্লে কাজ করেছেন সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু প্রসঙ্গে।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক ভাষা শিক্ষা থেকে পিএইচডি পর্যন্ত নিয়মিত বাংলাচর্চা করা হয়। আমেরিকায় অন্য যে সব বাংলাচর্চা কেন্দ্র আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল- (ক) মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় (মিনিয়া পোলিস)- এদের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগে একসময় বাংলা পড়ানো হতো। বর্তমানে বন্ধ আছে। (খ) হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় (হনলুলু)-এখানে বাংলা বিভাগে পড়াতেন অধ্যাপক র‍্যাচেল ভন বমার। এটিও বন্ধ হয়ে গেছে। (গ) কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (নিউইয়র্ক)-এখানে বাংলা পড়ানো হয়, তবে কোনো নিয়মিত কোর্স নেই। (ঘ) ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (কার্কলে)-এখানে বাংলা বিভাগ খোলা হয়েছে। (ঙ) কানাডা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মধ্যযুগ বিশেষজ্ঞ যোশেফ টি ও' কোনেল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে বৈষ্ণব কবিতা ও বৈষ্ণব ধর্মের উপর কাজ করেছেন। তিনি অধ্যাপক কাননবিহারী গোস্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে কাজ করে গেছেন। ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা সংবাদভাষ্য এবং ভারত-বাংলাদেশ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান বাংলাচর্চার অন্য বড় দৃষ্টান্ত। জার্মানের সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের যে সাংস্কৃতিক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে; তাও দুই দেশের ভাষা ও সাহিত্য শিল্পচর্চাকে ঘনিষ্ঠ করে তোলে। তবে এখানে নিয়মিত বাংলাচর্চা কেন্দ্র বলতে উল্লেখ করতে হয়-হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের নাম। এখানকার প্রধান দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। এখান থেকে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বহু বাংলা কবিতার অনুবাদ। এছাড়া জার্মানির বিভিন্ন স্থানের সামার স্কুলে বাংলা শেখনো হয়। এজন্য তারা বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষকও নিয়ে থাকেন। জার্মানির বনে রবীন্দ্র-চর্চার কেন্দ্র আছে। দীর্ঘকাল সেখানে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণায় যুক্ত ছিলেন অনেক জার্মান পণ্ডিত। জার্মানির বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশেষজ্ঞ মার্টিন কোপশেন ছিলেন প্রথম শান্তি নিকেতনবাসী।

প্যারিসের সোর্বন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শেখানোর ব্যবস্থা আছে। শেখান কবি লোকনাথ ভট্টাচার্যের স্ত্রী শ্রীমতী ফ্রাঁস ভট্টাচার্য। বাংলার বিশিষ্ট পণ্ডিত ফাদার দ্যাতিয়েনের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি রচনা করেছেন বাংলা গ্রন্থ 'ডায়েরির ছেঁড়া পাতা ও গদ্য পরম্পরা'র মতো মূল্যবান গ্রন্থ। তিনি কলকাতায় বহুদিন ছিলেন। মি. ফাদার দ্যাতিয়েন তাঁর ছাত্র-অনুরাগীদের নিয়ে একটি বাংলা শিক্ষা

কেন্দ্র, বাংলা গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন বেলজিয়ামে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বাংলাচর্চার কেন্দ্র আছে, তার অধ্যাপক দুশান জাভাবিতেন। তিনিই এ কেন্দ্র শুরু করেন। তিনি নিজে অনুবাদ করেছেন বাংলার বিখ্যাত পল্লীগীতি কাব্য 'ময়মনসিংহ গীতিকা'। প্রাগ (প্রাহা) বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলা পড়ানো হয়ে থাকে। পোল্যান্ডে ইন্ডোলোজি (ভারতবিদ্যা)-র বিষয় হিসেবে বাংলাচর্চার ব্যবস্থা আছে। রুমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বাংলা বিভাগ ছিল; পড়াতেন অধ্যাপিকা অমিতা রায়। তিনি বহু অনুবাদও করেছিলেন। ইতালির রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা বিভাগ আছে। একসময় অধ্যাপক ছিলেন রবীউদ্দিন আহমদ। এখন পড়ান তাঁর স্ত্রী।

অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ আছে। যেখানে গিয়েছিলেন অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়, অতীন্দ্র মজুমদার ও মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ম্যারিয়ান ম্যাডার্ন বহু বাংলা কবিতার অনুবাদ করেছেন।

পৃথিবীর বৃহত্তম বাংলা প্রকাশনা ছিল বিগত সোভিয়েত ইউনিয়ন আমলে সোভিয়েত দেশটির। তাদের বিভিন্ন বিদেশি ভাষার সহজ, সুন্দর প্রকাশনা ইতিহাসের এক বিরল অভিজ্ঞতা। তাদের বাংলা প্রকাশনা ছিল দারুণ সমৃদ্ধ। রাজনীতি, শিশু-কিশোর সাহিত্য, ধ্রুপদী সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞানের বিচিত্র বিষয়ে সব ধরনের প্রকাশনা ছিল। এজন্য তারা বিশিষ্ট কবি সমর সেন, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, বিনয় রায়, অরুণ সোম-এর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যেমন তাদের দেশে নিয়ে গেছেন, তেমনি তাঁদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলা পড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এক্ষেত্রে বিশেষ করে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করা যায়-মস্কো ও লেলিনগ্রাদ। এখানে ভাষা শিক্ষার নেতৃত্বে ছিলেন মাদাম ভেরা নেভিকোভা। মস্কো বেতারের বাংলা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখ্য নাম মাদাম মালকা নোভা। এশিয়ার অন্যান্য দেশের আলোচনার আগে একটা কথা স্মরণীয়; তা হল প্রাক-স্বাধীনতা পূর্বে ভারতের সঙ্গে জাপান, বার্মাসহ বিভিন্ন দেশের ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। বার্মায় তো এককালে বিপুলসংখ্যক বাঙালির যাতায়াত ছিল। এছাড়া জাভা সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপসমূহে ভারতীয় ও বাংলা সংস্কৃতির বহু নিদর্শন আজও মেলে।

আজ প্রযুক্তিবিদ্যার শ্রেষ্ঠ দেশ জাপান। এই জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের সাংস্কৃতিক যোগ দীর্ঘদিনের। রাজনীতি, ধর্ম, শিল্পসাধনা ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে সে সমন্বয়। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে জাপানি পণ্ডিতেরা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। জাপানে যেসব স্থানে বাংলা ভাষাচর্চার সুযোগ আছে তার মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য (ক) টোকিও বিদেশি ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে বাংলা ভাষা বিভাগের দায়িত্বে আছেন অধ্যাপক কে. নোরা। এই কে, নোরার সহযোগে ড. ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক রবীন্দ্র রচনার শব্দভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করেন। এছাড়া আছেন অধ্যাপক উচিদা ও শ্রীমতী উচিদা। অধ্যাপক উচিদা কাজ করেছেন বাংলার মনীষী অশ্বিনীকুমার দত্তের উপরে। (খ) চুকুবা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ টোকিও থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়াতেন অধ্যাপক কাজুয়ো আজুমা।



গবেষণা কাজের জন্য বহুবার তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখন তিনি জাপানে একটি বাংলাচর্চা কেন্দ্র পরিচালনা করেন। পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে চীনা ভবনের পরিকল্পনার মধ্যেই দুই দেশের সুদীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ঐতিহ্য ও আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে চীনের বিপ্লব সর্বোপরি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নানা প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এখনও বিদ্যমান। চিনের বিদেশি বিভাগ সোভিয়েতের মতো ব্যাপক সংখ্যায় না হলেও প্রচুর গ্রন্থাদির অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। এখনও চীন থেকে প্রকাশিত হয়। নানা বাংলা বই কলকাতায় ন্যাশনাল বুক এজেন্সিসহ নানা বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়। যার মধ্যে ধ্রুপদী গ্রন্থও যেমন আছে, তেমনি রূপকথা, শিশু-কিশোর সাহিত্য, রাজনীতি, সমকালীন নানা তথ্য আর ইতিহাস। চীনে যে প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত বাংলা চর্চা করা হয়-তার নাম ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল সায়েন্স-এর দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ। মরিশাসে ড. বিষ্ণুদয়ালের নেতৃত্বে গান্ধী ইনস্টিটিউট অব কালচার-এ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিয়মিত চর্চা হয়। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে রবীন্দ্র প্রয়াণের অর্ধশতক উপলক্ষে আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বহির্বিশ্বে অর্থাৎ বাংলাদেশ ছাড়াও বাংলা ভাষাচর্চা কতটা ব্যাপক ও বিস্তার লাভ করে চলেছে। বাংলা ভাষাচর্চা নানা দেশেই নানা প্রতিষ্ঠানে, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত উদ্যোগে চলছে জোরেশোরেই। এছাড়াও আছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশসহ এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বসবাসরত অসংখ্য বাংলাভাষী মানুষ ও তাদের প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত বাংলা পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, সংকলনসমূহ, যা বাংলাভাষার পঠন-পাঠনকে ও বাংলাচর্চাকে আরো জোরদার করেছে। এক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকেই প্রকাশিত হয় অন্তত আট-ন'টি বাংলা সাপ্তাহিকী। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ এম.এম. শাহীন প্রতিষ্ঠিত, 'ঠিকানা' কৌশিক আহমেদ সম্পাদিত 'বাঙালি', আবু তাহেরের সম্পাদনায় 'বাংলা পত্রিকা', নাজমুল আহসানের সম্পাদনায় 'বাংলাদেশ', কাজী জাকারিয়া সম্পাদিত 'এখন সময়' দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে। বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডিসি এলাকার বাঙালি সংস্থার প্রকাশনা 'নবপত্রিকা' ইতোমধ্যেই বেশি পরিচিতি পেয়েছে। এদের আরেকটি পত্রিকা 'সংস্কৃতি' সম্প্রতি বাঙালি পালা-পার্বণে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে প্রবাসীদের দৃষ্টি কেড়েছে। অটোয়া এবং টরেন্টো থেকে প্রকাশিত উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাঙালিদের পত্রিকা 'আমরা', বেঙ্গল এ্যাসোসিয়েশন অফ গ্রেটার শিকাগোর 'সমাজ সংবাদ', শিকাগো থেকে প্রকাশিত 'উন্মেষ গোষ্ঠী' ক্রমশ পরিচিতি পাচ্ছে।

দ্বিভাষিক ত্রৈমাসিক কবিতাপত্র 'শব্দগুচ্ছ' নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয় কবি হাসান আব্দুল্লাহর সম্পাদনায়। এটি একটি আন্তর্জাতিক কবিতার দ্বিভাষিক সংকলন। এর সঙ্গে সম্পাদনা ও লেখার সূত্রে জড়িয়ে আছেন একগুচ্ছ আমেরিকার ইংরেজিভাষী কবি। এই কবিতাপত্রের মাধ্যমে বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষারই কবিদের কাজের মধ্যে যোগাযোগের সেতু গড়িয়ে দিতে নিরলস কর্মে ও মেধা দিয়ে

চলেছেন কবি হাসান আব্দুল্লাহ। সঙ্গে উপদেষ্টা আছেন কবি জ্যোতির্ময় দত্ত ও কবি শহীদ কাদরী। এছাড়াও কবি শামস মবিন প্রকাশ করেছিলেন 'কবিতার কাগজ'। লুইজিয়ানা থেকে প্রকাশিত হয় 'পড়শী' নামের সাহিত্য পত্রিকা। লুইজিয়ানা থেকে প্রকাশিত হয় কামরুন জিনিয়া সম্পাদিত 'আকাশলীনা,' কানাডা থেকে দীনু বিল্লাহর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে আসছে 'বাংলা জার্নাল'। কবি আবু সাঈদ শাহীন সম্পাদনা করেছেন প্রায় আড়াই শতাধিক পৃষ্ঠার এক সংকলন, যাতে রয়েছে নবীন-প্রবীণ প্রায় সত্তরজন কবির কবিতা।

সাহিত্যচর্চায় এ ধরনের সৃষ্টিশীল নিদর্শন ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় সুইডেনের কথা। সুইডেনপ্রবাসী বাংলাদেশি সমাজ প্রচুর নিয়মিত-অনিয়মিত বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত প্রথম সংকলনটির নাম 'অন্বেষা'। এটি সুইডেনস্থ বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংঘের বার্ষিক সংকলন। সম্পাদক মো. হারুন রশিদ। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে প্রথম বাংলা মাসিক পত্রিকা 'আমার দেশ'। প্রাপ্ত তথ্যমতে, ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'ত্রৈমাসিক বাংলাদেশি'। কার্যনির্বাহী সম্পাদক এম. তারেক। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ থেকে প্রকাশিত হয় 'স্বদেশ বার্তা'। প্রতিষ্ঠাতা নূরুল আজাদ। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করছে 'পরিক্রমা'। এ ধরনের নিয়মিত-অনিয়মিত প্রচার প্রকাশনা রয়েছে গোটা ইউরোপ জুড়ে। এশীয় অঞ্চলের মধ্যে অতিসম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, কুয়েত, আরব আমিরাত, ইরান, দূরপ্রাচ্যের জাপান, কোরিয়া, চীন, সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে বাংলা সাহিত্যের চর্চা ও প্রসার বাড়ছে।

বহির্বিশ্বে প্রবাসী বাঙালিদের এইসব উদ্যোগের সঙ্গে ২০০৪ সালের জুন মাসে যুক্ত হয়েছে দিল্লি থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'প্রতীচী'। প্রমথনাথ বিশী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট প্রকাশনের পত্রিকা প্রতীচীর সম্পদনার দায়িত্বে রয়েছেন প্রমথনাথ বিশীর কন্যা ড. চিরশ্রী বিশী চক্রবর্তী। বাংলাভাষার প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশীর (১৯০১-১৯৮৫) জন্মশতবর্ষে দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত এই ট্রাস্টের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে 'বাংলাশিক্ষা ও সাহিত্যচর্চায় একটি গণ্ডীহীন অনুকূল পরিবেশ প্রস্তুত করাই প্রতীচী এবং প্রমথনাথ বিশী ট্রাস্টের মূল লক্ষ্য।

সারা পৃথিবীর অনাবাসী প্রবাসী এবং দেশবাসী সমস্ত বাঙালির মধ্যে একটা ভাষা ও সাহিত্যগত সেতুবন্ধন প্রচেষ্টাতেই প্রমথনাথ বিশী. ট্রাস্ট-এর প্রতিষ্ঠা। ...এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ট্রাস্ট বাংলার পঠন-পাঠন, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও বাংলা সংস্কৃতি প্রসারে সহায়তা করছে।' প্রতীচী বছরে দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়- 'নববর্ষ সংখ্যা' ও 'শারদ সংখ্যা'। প্রবাসী বাঙালিদের পাঠ-প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পত্রিকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। পত্রিকাটির এই ভূমিকা অব্যাহত থাকলে বাঙালি বিশ্বের যেকোনো প্রান্তেই থাকুক না কেন-তার মাতৃভাষাচর্চা ও অনুশীলন অন্তরায় দূরীকরণে প্রতীচী প্রবাসী বাঙালিদের সুদূরপ্রসারী সুযোগ সৃষ্টি করার পথ তৈরি করে দিতে পারবে।



বহির্বিশ্বে এখন বাংলাভাষী অভিবাসীর সংখ্যা একটা বড় অঙ্কে গিয়ে পৌঁছেছে। স্বাধীনতা-উত্তর দেশগুলোতে বিশেষত আশির দশক থেকেও ইউরোপ-আমেরিকায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে এবং ইউরোপ আমেরিকায় কানাডায় একটা শক্তিশালী এবং আত্মমর্যাদাশীল বড় কমিউনিটি তৈরি করতে পেরেছে। ফলত বাংলা ভাষাচর্চারও সুবিধা বেড়ে গেছে সেসব স্থানে অনেকাংশেই। ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েদের বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যসূচি পাঠ্যগ্রন্থ ও শিক্ষকের ব্যবস্থা করেছেন তারা। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাহিদার ভিত্তিতে বাংলা বই রাখা হচ্ছে-আছে বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠানসমূহ। বাবা-মারা সেসব দেখছেন। সাথে আছে এ প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরাও। তারা বাংলাভাষা সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে এবং বাংলা শিখছে, পড়ছে, বাংলা ভাষার উপর কাজও করছে।

অবাক বিস্ময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নিউইয়র্ক, টরেন্টো, সিউল, টোকিও, লন্ডনে বাংলা সাইনবোর্ড, যানবাহনে বাংলা নাম, বাংলা রেডিও-টিভি স্টেশন। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, লন্ডনে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রায় ৬,০৮,৫০০০ জনের মাতৃভাষা ইংরেজি এবং তারপরেই বাংলা ৪০,৪০০ জনের মাতৃভাষা। সিটি অব লন্ডন, টাওয়ার হ্যামলেটের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যথাক্রমে ৫৬.৪ ও ৫৩.৮ শতাংশ বাংলা ভাষায় কথা বলে। বিশ্বে প্রায় ৩০ কোটি বাংলা ভাষী রয়েছেন। এসব থেকে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আগামী দিনগুলোতে বাংলা ভাষা নেতৃস্থানীয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার রূপ পাবে (ইতোমধ্যেই ২১ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত-যা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে চরম গৌরবের)। সুতরাং আমরা প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে বলতে পারি, বিশ্বায়নের আগ্রাসনে ভাষা ইংরেজি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চাপিয়ে দেওয়া বিদেশি শিক্ষার প্রভাবে বাংলাভাষার অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে ধাবিত হবে- এ আশঙ্কা একেবারেই অমূলক। বরং উপরোক্ত আলোচনায় এই প্রত্যাশায় বলীয়ান হয়ে বলা যায়, বাংলাভাষা স্বদেশে ও বহির্বিশ্বে আদরণীয় ও কার্যকর ব্যবহারে এর আরও মর্যাদাপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করবে।

## শামীম আজাদ

# বিলেতের ক্লাসরুমেই বাংলা

আমার ছেলে সজীব অনেক ছোট বয়সে এদেশে আসে। মেয়ে ঈশিতার বয়স তখন ১৪ বছর। গোপনে গোপনে বাংলা কবিতা, গল্প লেখে। সে যে বাংলা ভুলবে না, জানতাম। সমস্যায় পড়লাম সজীবকে নিয়ে। সে তো আর কবিতা লেখে না।

বিলেতে তখন মাধ্যমিক স্কুলে ঠিক এখনকার মতোই একটি দ্বিতীয় ভাষা নিতে হত। আমি বলছি আজ থেকে দুই দশক আগের কথা। রেডব্রিজের ভ্যালেনটাইন স্কুলে ভাগ্যক্রমে দুজনেরই জায়গা হলো। ঈশিতা বাংলা নেবে বলায় আঁতকে উঠল স্কুল। আমরা প্রধান শিক্ষককে জোর দিয়ে বললাম, মেয়ের অন্যান্য বিষয়ের অবস্থান দেখো, সে ফেল করবে না। আমরা তাকে প্রাইভেট পড়িয়ে নেব। তোমরা শুধু স্কুল থেকে চিঠি লিখে দাও- মেয়ের মা-বাবা তাকে স্কুল থেকে বাংলা পরীক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার অনুরোধ করছে। অবাক হয়ে দেখলাম, কাজ হলো।

খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, মুক্তিযোদ্ধা মাহমুদুর রহমান বেণু বাংলা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত আছেন। আমার বন্ধু, লেখক, গবেষক ও ইংরেজির অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের বোন জাহিদা সাত্তার তখন টাওয়ার হ্যামলেটসে ছেলেদের মাধ্যমিক স্কুল স্টেপনি গ্রিনে পড়ান। বাঙালিদের দুর্বার আন্দোলনের ফলে সেখানে মাধ্যমিক স্কুলে জিসিএসইতে, এমনকি উচ্চমাধ্যমিকেও বাংলা নেওয়া যায় এমন ব্যবস্থা হয়েছে। বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর জন্য এ এক অপূর্ব সুযোগ। কারিকুলাম দেখে জাহিদার পরামর্শে মার্লবেরি গার্লস স্কুল থেকে তথ্য নিয়ে এখানে-সেখানে দৌড়াদৌড়ি করে, দেশ থেকে বই আনিয়ে আমার কাছেই পড়তে লাগল ঈশিতা।



তারপর জিসিএসইতে এক অসামান্য ফল করে ফেলল। আমরা অবাক হলাম না, কিন্তু অনেক খুশি হলাম।

এবার পড়লাম সজীবকে নিয়ে। রোজ গার্ডিয়ান থেকে এসে চেক করতাম তার করা বাংলা অনুবাদ। বাসার নিয়ম, কেউ বাংলা ছাড়া ইংরেজি বলবে না। সিলেটি থাকল পাশাপাশি। একটু বড় হলে দেশ থেকে হুমায়ূন আহমেদের বাংলা বই এনে দিলাম। পড়াটা ভালো হতে থাকল; কিন্তু বাংলা অনুবাদের দশা খারাপ হতে লাগল। 'যদি', 'যাব' লিখতে লাগল বর্গীয় জ দিয়ে। 'সকাল' বানান করতে লাগল তালব্য শ দিয়ে। আর এমন সব প্রশ্ন করতে লাগল, যা নিজে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করেও কখনো ভাবিনি। ওর নানা উদ্ভট প্রশ্নের কারণে খুঁজে বের করলাম শহীদজননী জাহানারা ইমামের লেখা বিদেশিদের বাংলা শিক্ষার বই। আমি বিলেতে আসার সময় তিনি বইটি হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি বিলেতের স্কুলে সে দেশের ছেলে-মেয়েদের পড়াতে যাচ্ছ, তোমার ছেলেমেয়েরা না বাংলা ভুলে যায়।'

তারপর শরতের এক সুশ্রী সকালে সজীব জিএসইর ফলে আমাদের হতবাক করে দিল। বাংলা মিলে তার সমগ্র ফল এমন হলো যে, প্রাইভেট এক স্কুলে বৃত্তিই পেয়ে গেল। ঈশিতাকে দিয়ে যে স্কুলে বাংলা শুরু হয়েছিল, সেখানে প্রতিবছরই বেশ কয়েকজন বাংলায় পাস করছে। টাওয়ার হ্যামলেটসসহ এ দেশের যেখানে বাঙালিরা আছে, যেখানে প্রতিবছরই বেশ কয়েকজন বাংলায় পাস করছে। টাওয়ার হ্যামলেটসহ এ দেশের যেখানে বাঙালিরা আছে, সেখানেই বাংলা স্কুল আছে। হয় স্কুল শেষে, নয় সপ্তাহান্তে মা-বাবার পরম উৎসাহে তারা বাংলা স্কুলে যায়। কিন্তু এখন এসেছে আরও বৃহত্তর সুযোগ। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডেয়ারিংয়ের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্কুল থেকেই ইংরেজির পাশাপাশি আরেকটি ভাষা পড়ার আইন হয়েছে। সে এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা বুঝে একটি কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজও হতে পারে। সুতরাং এদেশে এখনও প্রাইমারি স্কুলে আমাদের ছেলে-মেয়েরা বাংলা শিখতে পারবে, মূল ক্লাসঘরেই। বিলেতের প্রতিটি প্রাইমারি স্কুলে এখন ইংরেজির পাশাপাশি আরেকটি ভাষা তা শুধু চাইতে হবে। আমাদের দেশে একটা প্রবচন আছে 'কাঁচাতে না নোয়ালে বাঁশ/পাকলে করে ঠাসঠাস'। এছাড়া ওই প্রাইমারি বয়সই তো ভাষা আয়ত্ত করার কুসুম সময়। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক এবং তারপর উচ্চমাধ্যমিকের এই ভিন্ন ভাষা শিক্ষার জন্য রয়েছে অত্যন্ত আধুনিক ও যথাযথ কারিকুলাম। তাতে পড়া, শোনা, বলা, লেখা-এই চতুর্মাত্রিক ব্যবস্থাপনা। এ শুধু এখন বলে নয়, টাওয়ার হ্যামলেটসে যখন থেকে শুরু হয়েছে, তখন থেকেই। তবে ক্রমেই অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এরও হয়েছে আধুনিকায়ন। হাতেখড়ি হচ্ছে আমাদের দেশের সবুজ পাঠসহ গেলাম মুরশিদ ও ব্র্যাকের বই দিয়ে। এখন এই এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭১ শতাংশ ছেলে-মেয়েরই মাতৃভাষা ইংরেজি নয়। আর এর সংখ্যাগরিষ্ঠই বাঙালি। তবে লন্ডনের ভেতরে ক্যামডেন, নিউহ্যামেও অনেক বাঙালি। আর সারাদেশের কথা ভাবলে বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, কার্ডিফ, হার্ডফোর্ডশায়ার, স্যান্ডারল্যান্ড, নিউ ক্যাসল, লুটন-এসব স্থানেই বাংলাদেশিদের বসবাস সবচেয়ে বেশি। এদেশে তিন-তিনটি স্থায়ী শহিদ মিনারই আছে। আর

থাকবে না-ই না কেন- বিলেত হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাচীনতম অভিবাসন লক্ষ্য। স্বাধীনতার পবিত্র সংগ্রামেও বহির্বিশ্বে এদেশের বাংলাদেশিরাই ছিলেন সবচেয়ে সক্রিয়।

তাই হয়তো এখন থেকে আমাদের ছেলে-মেয়েরা মূল ক্লাসঘরে বাংলা শিখে একদিন বিশ্বের জন্য আবারও 'রোল মডেল' হবে। এখন দ্বি-ভাষী বাঙালি শিক্ষকের আর অভাব নেই। এখন বাংলা শেখানোর সময় ব্যবহার হবে ইন্টারেক্টিভ বোর্ড, রং, তুলি, বালি, বাগান, বাদ্য, ক্যাসেট, কম্পিউটার কত কী! স্প্যানিশ, জার্মান, ম্যান্ডারিনের সমান মর্যাদায় ও সময়ে পড়ানো হবে বাংলা। কেবল আমাদের মা-বাবাকে তা চাইতে হবে। ব্যাপারটি কত সহজ হয়ে গেছে! এদেশে আমাদের সব আন্দোলন ও অর্জনের পেছনে যেমন পূর্ব লন্ডনের উদ্যোগই অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে, এ ব্যাপারেও তা-ই। এবার জাতীয়ভাবে এ আন্দোলনে সোচ্চার আবার আমরাই। বিলেতের সব বাংলা কাগজ আর টিভির নেতৃত্ব দিচ্ছেন টাওয়ার হ্যামলেটসের সাবেক মেয়র গোলাম মুর্তজা, প্যারেন্টস সেন্টারের পরিচালক আবদুল হান্নান, সম্মানিত অগ্রজগণ এবং সঙ্গে আছেন আমার মতো শিক্ষকেরা। বাঙালি নেই, এমন কোনো স্থান সারা বিশ্বে খুঁজে পাওয়া আজ কঠিন। বাঙালি আজ অনেক দেশেই উচ্চপদে আসীন। নিজ জাতিসত্তা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সম্পত্তি রক্ষা-বাংলা কোথায় না লাগে?



অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান

# সর্বস্তরে বাংলা ভাষা শুদ্ধ বানানে শুদ্ধ উচ্চারণে

চারদিকে তাকিয়ে যা দেখি, তা থেকে কিছু না কিছু শিখি। একবিংশ শতাব্দী জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে বাংলাদেশের শহর-বন্দর-গ্রাম-গঞ্জ সর্বত্র অসংখ্য সাইনবোর্ড, ব্যানার, পোস্টার চোখে পড়ে। রঙ-বেরঙের ব্যানার পোস্টার নানারকম ভুল বানানে জর্জরিত। বাইরে চাকচিক্য, অথচ শব্দগুলো বানান ভুলে দৃষ্টিকটু। প্রত্যন্ত পল্লীতেও সাইনবোর্ড ঝুলছে। 'দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন' 'দারিদ্র্য' বিমোচনে এই প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু বানানটিতে যে দারিদ্র্য, যে বিভ্রান্তি রয়েছে সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সচেতনতার 'দারিদ্র্য' লক্ষণীয়। রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ডে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক ব্যবহারের জন্য প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ঘোষণা করেছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের মূল সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা'। সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতি লাভের পর ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি ইউনেস্কো

মহাসচিব কোইচিরো মাতসুয়ারা বিশ্বের ১৮৮টি দেশের কাছে চিঠি দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটি পালনের আহ্বান জানান।

বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে আমরা পেলাম প্রিয় বর্ণমালা; প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার জন্য আজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি পাচ্ছি। কিন্তু সেই ভাষার বর্ণ, শব্দ, বাক্য নানাভাবে ভুল উচ্চারণ কিংবা লেখার ক্ষেত্রেও বিকৃত হচ্ছে নানাভাবে।

বাংলাদেশের সাইনবোর্ড ব্যানার পোস্টারে যে সব ভুল বানান প্রতিদিন চোখে পড়ে, সেই সাইনবোর্ডগুলো আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

নগরীর বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠেছে কোচিং সেন্টার । শিক্ষা সহায়ক এই প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষাবিস্তারে যে ভূমিকা রাখছে, তা প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু ব্যানারে যখন দেখা যায় '২০০৮ খ্রিস্টাব্দে এস. এস. সি পরীক্ষার ফলাফল ভালো' - বাক্যটির ভ্রান্তি বোদ্ধা পাঠকের নিকট পীড়াদায়ক এ জন্য যে, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে এস. এস. সি পরীক্ষার ফল ভালো, এতে আমরাও আনন্দিত কিন্তু "ফলাফল ভালো" বাক্যটিকে ভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে, ফল ভালো হোক অফলকে দূরে ঠেলে- এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

নগরীর প্রাণকেন্দ্র থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত পল্লীতে ঔষধ বিক্রির জন্য রয়েছে ফার্মেসি, যা সাধারণ মানুষের কল্যাণে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে; কিন্তু 'মেডিসিন কর্ণার' 'ভূপতি ফার্ম্মেসী' এই বানানগুলো ঔষধ বিক্রেতা ও ক্রেতাকে ভাবিয়ে না তুললেও বাংলা ভাষার শুভাকাঙ্ক্ষীদের কষ্ট লাগাটা স্বাভাবিক। তাই 'মেডিসিন কর্নার' ও ভূপতি ফার্মেসি' যথার্থ বানানেই লেখা উচিত।

ঢাকা শহরে নীলক্ষেত নিউমার্কেট থেকে শুরু করে দেশের প্রতিটি জেলা শহরের মার্কেটে কিংবা অফিস-আদালতে রয়েছে ফটোকপি মেশিন। রং-বেরঙের সাইনবোর্ডে শোভা পাচ্ছে লেখাগুলো- 'দোলা ফটোষ্ট্যাট', 'দীপ ফটোষ্ট্যাট'। কিংবা 'এখানে ভালো মেশিনে ফটোষ্ট্যাট করা হয়। মেশিন ভালো, 'ফটোস্ট্যাট' ভাল- এটা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু নিরানন্দের ব্যাপার হচ্ছে 'ফটোস্ট্যাট' বানানটি ভুল। যা শিক্ষার্থীদের ভুল বানানের দিকে ঠেলে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত।

ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে সুউচ্চ বহু প্রাসাদ শোভা পাচ্ছে। আকাশছোঁয়া স্বপ্নের মতো উঁচু উঁচু ভবনগুলোতে কার না বসবাস করতে ইচ্ছে করে। ইষ্টার্ণ প্লাজা, ইষ্টার্ণ ভ্যালী, ইষ্টার্ণ মল্লিকা, ইষ্টার্ণ পয়েন্ট বসবাসের জন্য চমৎকার এ্যাপার্টমেন্ট তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সন্দেহটা বানানে। এই ভুল বানান প্রতিদিন চোখে পড়ে, এ্যাপার্টমেন্টে বসবাসরত ব্যক্তিদের, কখনো বা চোখে পড়ে পথিকের। ব্যস্ত নগরী ঢাকায় কারো থামার সময় নেই, সময় নেই ভুল বানানটির কথা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানোর। এভাবেই ভুল সাইনবোর্ড শোভা পায় নগরীর সুরম্য অট্টালিকায়। ভুল বানানগুলো দিনে যেমন চোখে পড়ে, রাতেও সোডিয়াম আলোয় বিকৃত হাসি হাসে। মহাখালী হতে হযরত শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যেতে কী চমৎকার নয়নাভিরাম দৃশ্য রাস্তার দু'ধারে! বিমানবন্দরের কাছাকাছি গেলে আরো মুগ্ধ হতে হয় চমৎকার পরিবেশ দেখে। বিমানবন্দরের প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণেই চমৎকার সাইনবোর্ড 'বলাকা' বাংলাদেশ বিমান প্রধান কার্য্যালয়'। সোনালি হরফে জ্বলজ্বল



করছে প্রতিটি শব্দ, সোনালি স্বপ্নের মতোই সাইনবোর্ড। কিন্তু দুঃখ হয়, কর্তৃপক্ষের অসচেতনতার কারণেই ভুল বানানে 'কার্য্যালয়' বছরের পর বছর রয়ে যায়। নবীন-প্রবীণ সকলের চোখেই ভ্রান্তির কালোছায়া পড়ে প্রতিদিন। বাংলামটর ছাড়িয়ে শাহবাগ এলেই 'চাঁন' মসজিদ, রোকেয়া সরণিতে 'লালচাঁন মসজিদ' চোখে পড়ে পথিকের। মসজিদ প্রার্থনার পবিত্র স্থান, কিন্তু বানানটিকে অপবিত্র করা হয়েছে 'চান'কে চাঁন করে। 'চাঁদ' হলে চন্দ্রবিন্দু শোভা পেত- খাঁ-তে যেমন পায়, গাঁ-তে যেমন হয়। 'খাঁন' চাঁন' লিখে যারা বানান ভ্রান্তি ঘটায়, পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে তারা বানানে ভ্রান্তির বিষ-বাস্প ছড়ায়। বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত প্রমিত বানানের নিয়ম দেশের সর্বত্র গৃহীত হচ্ছে, অথচ একাডেমির কর্মকর্তাদের যাতায়াতের জন্য নির্ধারিত বাসের সামনে লেখা রয়েছে 'ষ্টাফ বাস'। ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে 'ষ 'স্থলে 'স' হতেই হবে। দেশের সর্বত্রই স্টাফবাসগুলোর সাইনবোর্ড সংশোধন অত্যাবশ্যক। 'ঢাকা বোর্ড ষ্টাফ কোয়ার্টার' ভ্রান্তির অতলেই তলিয়ে আছে, রক্ষা করার দায়িত্ব সচেতন নাগরিকেরই। নগরীর প্রাণকেন্দ্রে আলোয় ঝলমল করছে 'অঞ্জলী জুয়েলার্স'। 'অঞ্জলী জুয়েলার্সে' সোনা খাঁটি হতে পারে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু খাঁটি নয় শুধু বানানটি। 'অঞ্জলীকে' শুদ্ধ করার দায়িত্ব 'অঞ্জলি জুয়েলার্সে'র মালিকের। শুদ্ধতার জন্য অনুরোধ করবে কোন বাংলা ভাষার দরদী পথিক, তার অপেক্ষায় প্রহর গুণছে পরবর্তী প্রজন্ম। অঞ্জলি বানান জানলে 'গীতাঞ্জলী' 'শ্রদ্ধাঞ্জলী' এসব ভুল বানানে সাইনবোর্ড, ব্যানার পোস্টার শোভা পেতো না।

প্রত্যূষে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে পুষ্প হাতে যারা শহিদ মিনারে আসে তাদের ব্যানারে 'শ্রদ্ধাঞ্জলী' লেখা থাকলে ভাষা শহিদদের আত্মা কষ্ট পায়। ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় প্রবেশ করলেই চোখে পড়ে 'হর্ণ বাজানো নিষেধ', এরূপ সাইনবোর্ড বহু প্রতিষ্ঠানের সামনেই শোভা পায়। নিষিদ্ধ হোক 'হর্ণ বাজানো' তাতে কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু আপত্তিটা 'হর্ন' বানানে 'ণ' প্রয়োগে। যেমন ভুল প্রয়োগ হয় 'কর্ণেল' শব্দটিতে। কোন পথিক একটু দাঁড়িয়ে বলবে কর্তৃপক্ষের কানে কানে 'হর্ণ' বানানে শুদ্ধরূপ 'হর্ন' হবে এবং 'কর্ণেল' হবে কর্নেল– সেই প্রত্যাশায় আছে পরবর্তী প্রজন্ম। 'জর্দা ছাড়া পান, তবলা ছাড়া গান' ভালো লাগে না– কথাটি বাংলা প্রবাদে প্রচলিত। পানে যারা জর্দা খায় নিষেধ করলেও তারা খাবেই, এটা তাদের নেশা, কিন্তু এভাবে 'জর্দ্দা' বানানটি লিখে যাদের নেশা হয়েছে, সে নেশা দূর না হলে পরবর্তী প্রজন্মকেও ভুল বানানের দিকে ঠেলে দেয়া হবে, তা মোটেই সমীচীন হবে নয়। 'বাবা জর্দ্দা' হোক আর 'রতন জর্দ্দা' হোক বানানটি শুদ্ধতার স্বচ্ছ সলিলে স্নান করিয়ে 'জর্দায়' পরিণত করতে হবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেটে প্রবেশদ্বারের পশ্চিম প্রান্তে 'ইকরা প্রিণ্টিং প্রেস' আর তেজগাঁ 'গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস' ভুল বানানে জর্জরিত, বিদেশি শব্দে 'ণ' হবে না। ণ-ত্ব বিধানের এই শাশ্বত নিয়মটি প্রয়োগ হয় না। বাংলাদেশের অধিকাংশ সাইনবোর্ডে 'ণ' 'ন' এর অপপ্রয়োগ হচ্ছে সর্বত্র। ঢাকা থেকে সিলেট সড়কে চলতে নরসিংদী প্রবেশকালে 'নরসিংদী জেলা প্রশাসকের কার্য্যালয়' বানানটি চোখে পড়ে, তেমনি 'ময়মনসিংহ পুলিশ সুপারের কার্য্যালয়' ও 'চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের

কার্য্যালয়' য-ফলা মুক্ত করা অতীব জরুরী। এত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডগুলো প্রতিনিয়ত চোখে পড়ে কত না পথিকের, নবীন শিক্ষার্থীরা এই সাইনবোর্ড দেখে ভুল বানান শেখে প্রতিদিন।

'বহুমুখী' উচ্চ বিদ্যালয়' বহু রয়েছে বাংলাদেশে। কিন্তু সমস্যাটা যখন মুখী 'মূখী' হয়। 'ফারহানা সম্পা বহুমূখী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়'। বহুমুখী এই উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ভালো, কিন্তু বহুমূখী বানানটি শুদ্ধরূপ 'বহুমুখী' হওয়া উচিত। মডার্ন পরিবহন কাউন্টারে গিয়ে 'মডার্ণ' বানান দেখে বিস্মিত হই, আবার কোথাও বিস্ময়ের সীমা থাকে না, যখন দেখি 'মর্ডাণ পরিবহণ'। আসুন, আমরা জনসচেতনতা সৃষ্টি করি। ভুল বানানে লিখিত সাইনবোর্ড অপসারণ করে অতিদ্রুত শুদ্ধ সাইনবোর্ড লাগাতে হবে, এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। ভুল সাইনবোর্ডধারী প্রতিষ্ঠানকে শুদ্ধতার সুযোগ দিয়ে নোটিস দিতে হবে। প্রয়োজনে আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

নোটিস প্রাপ্তির পর শুদ্ধ না করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভাষাকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা দেশের সর্বস্তরের মানুষের দায়িত্ব।

<u>বানান ভ্রান্তি নিরসনে পদক্ষেপসমূহ:</u>

১। প্রশাসনের সতর্ক দৃষ্টি ২। জনসচেতনতা সৃষ্টি করা ৩। শিক্ষক - শিক্ষার্থীদের মাঝে বানান বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করা। ৪। সাইনবোর্ড, ব্যানার, পোস্টার লিখনশিল্পীদের বানান বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ৫। সকলের মাঝে বাংলা ভাষার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম সৃষ্টি করা।



## অধ্যাপিকা বিলকিস খানম পাপড়ি

# আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্দোলন

বাঙালি জাতির জীবনে ৫২ ও ২১ একটি স্মারক। বাহান্নর সাথে একুশের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বা বাঙালি জাতিকে জাতি হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্থান করে নিতে বাধ্য করেছে। একুশ বাঙালি জাতিকে অনেক কিছু দিয়েছে। একুশ দিয়েছে রাষ্ট্রভাষা, একুশ দিয়েছে বুলেট দিয়ে ঝাঁঝরা করা অনেক তাজা প্রাণ। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট মি. জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিক থেকেই। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত উর্দু সম্মিলনে এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়া উদ্দিন আহমদ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ ও আবুল কাশেমের তিনটি প্রবন্ধ নিয়ে, পাকিস্তানের 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শীর্ষক প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার আহ্বান জানানো হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, ড. মুহাম্মদ এনামুল হক প্রমুখ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জোরালো দাবি নিয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দুর সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব রাখেন। তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং পূর্ব বাংলার

মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় তা অগ্রাহ্য হয়ে যায়। এর প্রতিবাদে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে 'রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' গঠিত হয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ জানুয়ারি সমগ্র পূর্ববাংলায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে 'হরতাল' পালিত হয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের এক প্রস্তাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এই সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন শামসুল হক। গণপরিষদের ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ ঢাকা শহরে ছাত্রসমাজ 'রাষ্ট্র ভাষা দিবস' পারন করে। তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকার শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান ও অলি আহাদসহ অনেক ছাত্রনেতা ও বুদ্ধিজীবীকে গ্রেপ্তার করে। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মি. জিন্নাহ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তৃতীয় সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সফরে আসেন। ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় তিনি বলেন যে, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অপর কোনো ভাষা নয়'। ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি আবারো জোর দিয়ে বলেন যে, 'উর্দু এবং শুধু উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' জিন্নাহ সাহেবের ঐ ঘোষণার প্রতিবাদে সমাবর্তন সভায় উপস্থিত ছাত্ররা 'না 'না' ধ্বনি দিয়ে ওঠেন। জিন্নাহ সাহেবের উক্তি ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। খাজা নাজিমুদ্দিন ছাত্র অসন্তোষের মুখে ছাত্রনেতাদের সাথে একটি ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এতে বলা হয় যে, পূর্ব বাংলায় ইংরেজি স্থলে বাংলাকে সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে গ্রহণ করা হবে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে শুরু হয় নতুন ষড়যন্ত্র। বাংলা হরফ পরিবর্তন করে আরবি হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা করা হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর সরকারের 'ভাষা কমিটির রিপোর্টে' পূর্ব বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষারূপে পাঠ করার সুপারিশ করা হয়, এর ফলে বাঙালি জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান কর্তৃক গণপরিষদে পেশকৃত 'মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে, উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করায় পূর্ব বাংলার জনগণ এবং গণপরিষদের বাঙালি সদস্যগণ বিক্ষুব্ধ হন।

কেননা ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তানের জনগণের শতকরা হার ছিল নিম্নরূপ:

| মুখের ভাষা | শতকরা হার |
|---|---|
| বাংলা | ৫৬.৪০% |
| পাঞ্জাবি | ২৮.৫৫% |
| সিন্ধি | ৫.৪৭% |
| পশতু | ৩.৪৮% |
| উর্দু | ৩.২৭% |
| বেলুচি | ১.২৯% |
| ইংরেজি | ০.০২% |
| অন্যান্য | ১.৫২% |



১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ঢাকা অধিবেশনে এবং পল্টন ময়দানের জনসভায় পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে সর্বদলীয় কর্মসমাবেশে সকল রাজনৈতিক দলের সদস্য সমবায়ে একটি 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হয়। এই সভায় স্থির হয় যে, ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে। ২১ ফেব্রুয়ারি দিবসের কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য ৪ ফেব্রুয়ারি 'হরতাল' এবং ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি সাফল্যের সাথে 'পতাকা দিবস' পালিত হয়। কারাগারে আটক অবস্থায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা' ও 'বন্দী মুক্তির' দাবিতে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন আহমদ আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।

নূরুল আমীনের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার ও ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকে ঢাকা শহরে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সংগ্রামী ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ছোট ছোট শোভাযাত্রাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরনো কলাভবন প্রাঙ্গণে মিলিত হয়। ছাত্রনেতা গাজিউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের আমতলায় ঐতিহাসিক সভা শুরু হয় সেখানে ছাত্রনেতা আবদুল মতিনের প্রস্তাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শোভাযাত্রাসহ মায়ের ভাষা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পেশ করার জন্য প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে (বর্তমানে জগন্নাথ হল মিলনায়তন) যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় গেটের বাইরে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরা ভেদ করে অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা শান্তিপূর্ণভাবে এগিয়ে চলতে থাকে। শান্তিপূর্ণ এই মিছিলটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে এলে পুলিশ ও ইপিআর নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ স্লোগানে। পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে ছাত্রদের দশজনের খণ্ড মিছিল পরিষদ ভবনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। পুলিশের গুলিতে নিহত হন এমএ ক্লাসের ছাত্র বরকত, তেজোদীপ্ত তরুণ সালাম ও আব্দুল জব্বার অন্যান্য।

ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। অবশেষে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়, আর এর মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ।

এ জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে উদ্ভব হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এটি ছিল বাঙালির প্রথম স্বাধিকার আন্দোলন। এর ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে এবং বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে। এর ফলে বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃত হয়।



**হায়দার রাহমান**

# বাংলা ভাষা-সাহিত্য পরিক্রমা

চলমান বিশ্বে বাংলা একটি বিকাশমান ভাষা। বাংলা বাঙালি জাতির মাতৃভাষা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে এর স্বীকৃতি আছে ভারতের বাংলাভাষী রাজ্যসমূহ ছাড়াও আফ্রিকার সিয়েরালিওনে। বাংলাদেশে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের চর্চা হয়, চর্চা হয় বিদেশেও। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রয়েছে এককোটি বাঙালি জনগোষ্ঠী। তারা বাংলা ভাষায় বেতার-টিভি, পত্র-পত্রিকা পরিচালনা করেন, গবেষণা-অনুষ্ঠান-প্রকাশনা করেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলা মেলার আয়োজন হয়। ইংল্যান্ড আমেরিকা চীন জাপানসহ বিভিন্ন দেশের বেতার-টিভিতে বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার হয়। চীনা টিভির বাংলাা অনুষ্ঠান করেন চীনারাই। বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সহ, গবেষণাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলাভাষার চর্চা হয়। বিভিন্ন শহরের সড়ক-স্থাপনায় বাংলা নামকরণ হয়েছে এবং হচ্ছে। আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশের ভোটার তালিকা করা হয়েছিলো বাংলায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি। তিনি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে মর্যাদাবান 'নোবেল পুরস্কার' পেয়ে বাংলা সাহিত্যের বিশ্বায়ন ঘটিয়েছিলেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দিয়ে জাতির গৌরবকে বিকশিত করেছিলেন। বাঙালিই একমাত্র জাতি, যারা মাতৃভাষার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য জীবন দিয়েছিলো। জাতিসংঘ কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার পর বাংলা ভাষার মর্যাদা ও অধিকার বিশ্বব্যাপী বেড়েছে। বাংলা ভাষা-সাহিত্য নিয়ে দেশে দেশে বেড়েছে আগ্রহ ও সম্ভাবনা। এই স্বীকৃতি বাঙালি জাতির মর্যাদা বাড়িয়েছে, বৃদ্ধি করেছে দায়িত্বশীলতা। বাংলাকে যে

জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষার প্রস্তাব করা হয়েছিলো, তা এ ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি ও বিকাশমানতার ধারাবাহিকতা।

সাহিত্যের মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। ভাষাই সাহিত্যকে গুরুত্বপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও গতিশীল করে। তবে জন্মের পর থেকেই এই ভাষা-সাহিত্যকে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়েছিলো। প্রকৃত সংগ্রামীরা বিজয়ী হয়। বাংলা সংগ্রামী ভাষা। সুদীর্ঘকালের বাংলা সাহিত্যকে বহুমুখী প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে বর্তমানকাল পর্যন্ত আসতে হয়েছে। এ ব্যাপারে বাংলা ভাষা সাহিত্যের উৎস ও গতিপথ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন হিসেবে চর্যাপদকে গণ্য করা হয়। চর্যাপদ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নেপাল রাজের রয়েল লাইব্রেরি থেকে উদ্ধার করা হয়। এটি একটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি; যাতে ৫০টি সম্পূর্ণ ও একটি খণ্ডিত চর্যা ছিল। এই ৫১টি চর্যার ২৩/২৪জন চর্যাকার। চর্যাগুলোর আঙ্গিক গীতিধর্মী কবিতা, গীতির বিভিন্ন রাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত। চর্যাকাররা সহজিয়া বৌদ্ধমতের তান্ত্রিক। লেখাগুলো রূপকধর্মী। তবে তাতে সমাজ জীবনের বাস্তব বিষয়চিত্র ও ভাবনা প্রতিফলিত আছে। চর্যার ভাষাকে বলা হয় 'সান্ধ্য ভাষা'। আর সে সব সন্ধ্যার প্রকৃতির মতো আলো-আঁধারিতে অস্পষ্ট কিছু বুঝা যায়, কিছু বুঝা যায় না। তার ভাব গভীর এবং বাঙালির জীবনযাপনের চিত্র তাতে প্রতিফলিত। তবে চর্যাকাররা বাঙালি এবং চর্যার ভাষা যে বাংলা তার প্রমাণ রয়েছে চর্যাতেই। চর্যাকার ভুসুকু পা তার এক চর্যায় উল্লেখ করেছেন– 'ভুসুকু আজিকে বঙালি ভইলি' এবং পড়লে মনে হয় 'বাঙালি' পরিচয়ে তার আত্মতৃপ্তি আছে। তিনি বাঙালি জাতি হিসেবে পরিচয় দিতে পেরে গর্বিত। চর্যার কাল সম্পর্কে দ্বিমত নয়, বহুমত আছে। ভাষা গবেষক ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. হুমায়ুন আজাদসহ অধিকাংশ পণ্ডিত ৯৫০ খ্রিস্টাব্দকে চর্যার সূচনাকাল চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যার কাল ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ। তিনি চর্যাকারদের ব্যাপ্তি সপ্তম শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত নিরূপণ করেছেন। চর্যার কাল যাই হোক, প্রাপ্ত পুঁথির উপর ভিত্তি করে পণ্ডিতেরা তাকেই 'আদি নিদর্শন' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং চর্যাকারগণকেই 'আদি লেখক' বলে গণ্য করেছেন। আবার পণ্ডিতেরা একথাও বলেছেন, বাংলা সাহিত্যের 'আদিকবি' মীননাথ, চর্যাকাররা তার শিষ্য বা অনুসারী। তা যদি সত্য হয়, মীননাথের সাহিত্যের নিদর্শন কোথায়? তাকে কিসের উপর ভিত্তি করে 'আদিকবি' বলা যায়– সে সম্পর্কে পণ্ডিতগণ নিরব। তাছাড়া চর্যাপদ যদি আদিকবিতা হয়ে থাকে, তবে বাংলা ভাষার নিশ্চয় আদিকাল নয়। বাংলা ভাষার উৎস অবশ্যই আরও অতীতে। কারণ ভাষার জন্ম হলেই তা দিয়ে কবিতা রচিত হওয়ার কথা নয়। কবিতা লেখার মতো পর্যাপ্ত শব্দের অবশ্যি প্রয়োজন। চর্যার ভাষাকে বলা হয়েছে 'সান্ধ্য ভাষা'। যার কিছু বুঝা যায় আর কিছু বুঝা যায় না। সন্ধ্যার আলো-আঁধারির মতো অস্পষ্ট ও রহস্যজনক। চর্যাকাররা বৌদ্ধধর্মের সহজিয়া মতের অনুসারী। চর্যার এই রহস্যময়তা তান্ত্রিকদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কিনা, তা ভেবে দেখার অবকাশ আছে। তাছাড়া তারা কি বৌদ্ধ ধর্মগোষ্ঠীর মূলস্রোতের কিংবা বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর ভাষা



সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করেছে, নাকি বাউল সম্প্রদায়ের মতো খণ্ডিতাংশের প্রতিনিধিত্ব করেছে? কথিত আদিকবি মীননাথ কিংবা তার সমসাময়িক বা আরও আগের কবিদের তথ্য-নিদর্শন পাওয়া গেলে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো। চর্যাপদের আগের কাল কি বাংলা সাহিত্যের কৃষ্ণকাল না শূন্যকাল?

বাংলা ভাষার উৎস সম্পর্কে উজানে খোঁজ নেয়া যাক। কোনো কোনো পণ্ডিত আর্য (সংস্কৃত) ভাষাকে বাংলা ভাষার উৎস বলে অভিমত দিয়েছেন। তাদের মতে, 'আর্য ভাষা' থেকে 'প্রাকৃত ভাষা' হয়েছে, সেখান থেকে বাংলা অসমিয়া মৈথিলি প্রভৃতি ভাষার জন্ম হয়েছে। কিন্তু আর্য ভাষা এদেশের মাটির ভাষা নয়। আর্য জাতি যেমন বহিরাগত, তেমনি আর্য ভাষাও বহিরাগত। তারা ছাড়াও পরবর্তীকালে অনেক জাতি এদেশে রাজত্ব করেছে, শাসকদের মুখের ভাষা 'রাজভাষা' হিসেবে চাপিয়ে দিয়েছে; কিন্তু আরবি ফারসি ইংরেজি উর্দুসহ সে সব ভাষা বাঙালির বৃহত্তর জন-গোষ্ঠীর উপর প্রভাব ফেলতে পারেনি। বরং তাদের ভাষার যে সব শব্দ বাঙালি গ্রহণ করেছে, কালের প্রবাহে সেসব শব্দ বাংলা ভাষায় মিশে গেছে। আর যে বিষয় প্রশ্নসাপেক্ষ তা হলো, প্রকৃতি থেকে যে ভাষার জন্ম তাইতো প্রাকৃত। বহিরাগত আর্য ভাষা থেকে প্রাকৃত ভাষা হয় কি করে? চর্যাপদে তো আর্য ভাষার কোনো ছায়া নেই। নাথ সাহিত্যেও নেই। নাথ সাহিত্য তো মেদহীন নিটোল বাংলা। বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের মিশেল দেখা যায় সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে, যা বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়েছে। আর দেখা যায়, পূজা পার্বণের মন্ত্রে, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের রচনায়। তখন সংস্কৃতের বেদসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অন্তঃপ্রাণ এবং পূজা পার্বণের মন্ত্রে বিশ্বাসী লোকরাও ছিল সংস্কৃতঘেঁষা। তবে সংস্কৃত ছিল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের একচেটিয়া সম্পত্তি। নীচ শ্রেণির লোকদের জন্য সংস্কৃতচর্চা ছিল নিষিদ্ধ। কোনো নিম্নশ্রেণির লোক সংস্কৃত শুনলে তার কানে গরম সীসা ঢেলে দেয়া হতো। তাদের ধর্মীয় শ্লোকে বলা হতো–

'অষ্টাদশ পুরানানিচ রহস্য চরিতানিচ
ভাষায় লোক শ্রোত্বা রৌরব নরক ব্রজেৎ

অষ্টাদশ পুরাণানি যারা শ্রবণ করবে, তারা রৌবব নরকে যাবে। বাংলা বা দেশি ভাষার প্রতি তাদের কী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। সে সময়কার কিছু কিছু লেখকের রচনায় সংস্কৃত ভাষার মিশ্রণ ও প্রভাব দেখা যায়। অথচ কবি দ্বিজ বংশীদাস ও চন্দ্রাবতীর সাহিত্যে আমরা ভেজালমুক্ত বাংলা ভাষাই পাই। আর্যরা আসার বহু আগে থেকে বঙ্গ জনপদে দ্রাবিড়, হুন শকসহ আরও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে আসছে, সংস্কৃতঘেঁষা পণ্ডিতরা যাদেরকে 'নীচ জাতি' বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদের ভাষাকে 'পক্ষীর ভাষা' বলে ঠাট্টা করেছেন। সেই তথাকথিত পক্ষীর ভাষাটিই কি বাংলা?

বাংলা ভাষার আপাত আদিনিদর্শন 'চর্যাপদ' ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের রাজকীয় লাইব্রেরি থেকে উদ্ধার করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে, চর্যাকাররা পাল বা সেন রাজাদের অত্যাচারে দেশ ছাড়া হয়ে নেপালে রাজার দরবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এখন যখন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও খননের ফলে

পাহাড়পুর ময়নামতি লালমাই উয়ারী বটেশ্বর, মুন্সীগঞ্জ, সুন্দরবন প্রভৃতি এলাকায় বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধ সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন আবিষ্কৃত হচ্ছে, তাতে বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির প্রমাণ কিছু অঞ্চলে পাওয়া যায়। তবে আবিষ্কৃত বিহারগুলো বেশির ভাগ বিদ্যাকেন্দ্রিক, শাসনকেন্দ্রিক নয়। পাল ও সেন আমলে যদি বিহারগুলো ধ্বংস করা হয়ে থাকতো, তাহলে সেখানে থাকা মানুষজনের মাথার খুলি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাওয়ার কথা; তা নেই কেন? বৌদ্ধদের বিহারগুলোর বাইরে অনেক জায়গায় তথাকথিত নীচ জাতির বাস ছিল। পাল বা সেনরা তো ক্ষমতার লড়াই করেছে। বৌদ্ধরা কি তাদের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিল? যে কারণে বিহারগুলো ধ্বংস করা হয়ে থাকতে পারে? চর্যাকাররা কি বিদ্রোহী ছিলেন, যে কারণে তদেরকে প্রাণ ভয়ে দেশ ছাড়া হতে হয়? চর্যার ভাব ও ভাষা কিন্তু তা বলে না। ৫০টি চর্যার একটিতেও বিদ্রোহের সুর বা আভাস নেই কেন? চর্যায় চরম দারিদ্র্য আছে, পারিপার্শ্বিক বর্ণনা আছে, প্রেম অনুরাগ অনুযোগ আছে, বিন্দুমাত্র ক্ষোভ বা দ্রোহ নেই। বরং ভুসুকু পার ভাষায়– 'আজিকে ভুসুকু বঙালি ভইলি'– বাঙালি জাতে ওঠার স্বীকৃতি ও আত্মতৃপ্তি আছে। কাজেই চর্যাকারদের অত্যাচারিত হয়ে দেশত্যাগ ও নেপাল রাজদরবারে আশ্রয় নেয়ার কথা অমূলক। তাহলে তারা কেন সেখানে গিয়েছিলেন? চর্যাপদই বা কিভাবে নেপালে গেলো?

চর্যাপদতো সঙ্গীত। যন্ত্র সহযোগে তা গীত হয়। 'চর্যা গবেষক' কবি আলীম মাহমুদ তাতে সুরারোপ করেছেন এবং অনেক অনুষ্ঠানে সদলবলে পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। প্রতিটি চর্যার পাদদেশে স্পষ্টভাবে বিভিন্ন রাগের নাম যুক্ত আছে। এমন ভাবা যায় না– চর্যাকাররা বা তাদের প্রতিনিধি নেপাল রাজদরবারে গিয়েছিলেন বাণী ও যন্ত্রসহযোগে চর্যাগীতি শোনাতে? রাজা তাদের সে গীত শুনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং সমাদর করে, উপঢৌকন দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন? রাজা চর্যার একটি কপি উপহার হিসেবে গ্রহণ করে রয়েল লাইব্রেরিতে সযত্নে সংরক্ষণ করেছিলেন? এমন দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়, বাঙালি পণ্ডিত শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের ক্ষেত্রে। তিনি দেশান্তরী হয়েছিলেন বিতাড়িত হয়ে নয়, জ্ঞান অন্বেষণে। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের উপর এমনই পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন যে, তাকে একাধিক বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়েছিলো। তিনি বিভিন্ন রাজদরবারে সমাদৃত হয়েছিলেন। মুন্সীগঞ্জের বজ্রযোগিনী, তার নিজ গ্রামে সম্প্রতি আবিষ্কৃত বৌদ্ধবিহার তিনি নির্মাণ করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

আরও একটি দৃষ্টান্ত। বাংলা ভাষার কবি আলাওল আরাকানে (বর্তমানে মিয়ানমারের প্রদেশ) গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে তার জীবনে অনেক বিপর্যয় ঘটে। তিনি ডাকাতদের হাতে বন্দী হয়ে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি হন ও পরে মুক্তি পান। আরকানের রোসাং (রোহিঙ্গা) রাজদরবারে সভাকবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। আলাওল, দৌলত উজির প্রমুখের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য আলোকিত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলো। কাজেই একথা সংশয়হীনভাবে বলা যায়, চর্যাকাররা বিতাড়িত হয়ে নেপাল যাননি, গিয়েছিলেন সসম্মানে।



বাংলা ভাষার উৎস সন্ধানে আরো উজানে যাওয়া যাক। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে যে ১৬টি জনপদের উল্লেখ আছে, তার অন্যতম জনপদ 'বঙ্গ'। অনুসন্ধানে জানা যায়, মৈথিলি ভাষায় 'ললিত বিস্তর' নামে একটি প্রাচীন গ্রন্থ আছে। তাতে লেখা আছে, কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থকে (গৌতম বুদ্ধ) সর্ববিদ্যায় শিক্ষা দিয়ে পারদর্শী করে তোলা হয়েছিলো। তিনি ৬৪ লিপি (ভাষা) আয়ত্ত করেছিলেন, যার মাঝে বঙ্গলিপির ক্রম ছিল তিন। ললিত বিস্তরের তথ্য সত্য ধরে নিলে বলা যায়, তখনও বাংলা ভাষার অস্তিত্ব ছিল। শুধু অস্তিত্ব নয়, রাজকুমারের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য সমৃদ্ধ ভাষাই ছিল। রাজকুমার তো আর যেন-তেন ভাষা শিক্ষা করেননি। সে কালতো যিশুখ্রিস্টের আবির্ভাবের ৮০০ বছর আগের কথা। বৈদিক সাহিত্য 'ঐতরেয় আরণ্যক' 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থেও 'বঙ্গ' নামের উল্লেখ আছে। তাহলে বাংলা ভাষার উৎস কি আরও উজানে? সে সবের নিদর্শন কোথায়? ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষার উৎসকাল খ্রিস্টপূর্ব পাঁচহাজার বছর আগের বলে উল্লেখ করেছেন। এবার আসা যাক, বাংলা সাহিত্যের কাল পর্যালোচনায়। পণ্ডিতগণ বাংলা সাহিত্যকে তিনটি কাল বা পর্বে ভাগ করে থাকেন। তার মধ্যে প্রাচীন যুগ ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে শুরু), মধ্যযুগ ১৩৫০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, আধুনিক যুগ ১৮০০ থেকে বর্তমান এবং আগামীর বহুদিন পর্যন্ত। এর মাঝে ১২০০ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অন্ধকার যুগ, কারণ এই সময়ের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। ১২০০ খ্রিস্টাব্দের আগের নিদর্শন আছে, ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দের পরের নিদর্শন আছে, মাঝখানের ভাষা সাহিত্যের নিদর্শন কোথায়– তা রহস্যজনক ও প্রশ্নসাপেক্ষ। তখনকার বাঙালিরা কি বোবা হয়ে গিয়েছিলো? নাকি ঝড় বন্যা জলোচ্ছ্বাস ভূমিকম্পের ফলে বৌদ্ধবিহারের মতো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো? প্রশ্ন হচ্ছে, চর্যাপদ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিদর্শন রক্ষা পেলো কিভাবে? আরেকটা প্রশ্ন– চর্যাপদ থেকে মীননাথ কিংবা তার আগে ললিত বিস্তরের তথ্যমতে, গৌতম বুদ্ধ বা আরো আগের নিদর্শনই বা কোথায়? এটাও কি কৃষ্ণকাল? তাই মানতেই হবে, বাংলা সাহিত্যের কৃষ্ণকাল দুটি; একটি মাঝের, আরেকটি আগের। সবশেষে ভাষা সাহিত্যের দেশান্তর সম্পর্কে বলেই ইতি টানবো। ভাষা-সাহিত্য এ যুগেও যে দেশান্তর হয়, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাংলাই। সুদূর আফ্রিকার দেশ সিয়েরালিওন যে বাংলাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে, তাতো এক প্রকার দেশান্তরই। কাজটিতে অবদান রয়েছে 'জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে' নিয়োজিত বাঙালি সৈনিকদের। সারা পৃথিবীতে এককোটি বাংলাদেশি বাঙালি অভিবাসী। তাদের উদ্যোগে লন্ডনে 'বাংলা টাউন' হয়েছে, নিউজার্সিতে বাঙালি কলোনি হয়েছে। ইংল্যান্ড আমেরিকা কানাডা জার্মানি চীন জাপানসহ বিভিন্ন দেশে বাংলা ভাষার চর্চা অব্যাহত গতিতে বাড়ছে। উত্তর আমেরিকার কবিতা উৎসব 'ফোবানা' সম্মেলন প্রবাসী বাঙালিদের মহামিলনে নতুনমাত্রা যোগ হয়েছে। মালয়েশিয়া পরিণত হয়েছে সেকেন্ড হোমে। আর চীনারা? তারা নিজেরাই তাদের বেতার-টিভিতে বাংলা অনুষ্ঠান করছে। এর সাথে ভারতীয় বাঙালিদের অবদানও কম নয়। তবে বাংলাভাষার এই বিস্তার ঘটেছে ভালোবেসে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও

অন্যান্য জাতির মতো চাপিয়ে দিয়ে নয়। একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর নতুনমাত্রা যোগ হওয়ার পাশাপাশি সম্ভাবনা বহ গুণে বেড়ে গেছে।

সিয়েরালিয়নে বাংলা ভাষার সরকারি স্বীকৃতি পেলেও তা জাতির মূলস্রোতের দ্বারা সমাদৃত ও চর্চা না থাকলে একসময় রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। চর্চার অভাবে ভাষা-সাহিত্যের অপমৃত্যু ঘটে, তার উদাহরণ সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত এখন 'কোমায়'। পূজা-পার্বণ ছাড়া এ ভাষার অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায়। বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ও বিকাশে তাই আমাদের দায়িত্বশীল কর্তব্যপরায়ণ হতে হবে। শেষ কথা– বাংলা ভাষার যে দুটি কৃষ্ণকালের কথা বলা হয়েছে, তাতে আলো জ্বালাতে হবে। উদ্ধার করতে হবে হারানো মানিক। চর্যাপদ নেপালের রয়েল লাইব্রেরি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। কে জানে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের কৃষ্ণকালের নিদর্শন বিশ্বের কোনো জাদুঘর বা লাইব্রেরিতে উদ্ধারের অপেক্ষায় পড়ে আছে।

**তথ্যসূত্র:**


* সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোহা
–ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
* চর্যাপদ
– অহীন্দ্র মজুমদার
* লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী
– ড. হুমায়ুন আজাদ
* বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ।